রুদ্ধ আবেগ



শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্যামা পূজা ১৩৩৪

 [এক টাকা।

—প্রকাশক—
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল।
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
৯৮।১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস,
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২৫, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রুদ্ধ আবেগ

এক

টিফিনের পর স্কুল বসিয়া গেল,—শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লইয়া, ভাল-ছেলেটীর মত আবার সব ক্লাসে গিয়া বসিলাম;—পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, শিক্ষকের অভাবে কোলাহল বিন্দুমাত্র কমে নাই, সহসা প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী মিস সেন একখণ্ড স্লিপ লইয়া, চটি জুতার কটাফট্ শব্দ করিতে করিতে আমাদের ক্লাসে ঢুকিলেন। তাঁহার এই সহসা আগমনে কোলাহলপূর্ণ গৃহখানি নিঝুম রাতের ন্যায় একেবারে শান্ত স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবলমাত্র চুড়ির মৃদু আওয়াজ এবং দৃষ্টিবিনিময় চলিতে লাগিল। মিস্ সেন গম্ভীর এবং ততোধিক কঠোর-কণ্ঠে বলিলেন,—মিনতি রায়,—বইখাতা নিয়ে অফিস ঘরে এসো!

তরুণ বক্ষখান আমার সহসা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের কৌতুহলী এবং উদ্বেগভরা দৃষ্টিগুলি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। এ আহ্বানের ফল যে বড় সুবিধার হইবে না, তাহা সকলেই জানিত এবং আমিও জানিতাম যে স্কুলে কিম্বা বোর্ডিংএ

এমন একটা মহা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যাহার ফলভোগ করিবার জন্য আমাকে এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ক্লাসের বাহিরে আসিতেই মিস্ সেন গম্ভীরভাবে বলিলেন,—তোমার কোন ভাই-টাই আছেন?

পিতার একমাত্র কন্যা হইয়াই, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতির সমস্ত দাবী আমি একাই বহন করিতেছি, বলিলাম,—না, নেই।

—মাস্তুতো, কি পিস্তুতো?

হাঁ, তা আছেন।

অফিস-ঘরের সুমুখে আসিয়াই, তিনি একটী যুবকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—আপনি একেই চান কি?

তিনি রিমলেশ চশমার স্বচ্ছ কাচ দুটীর ভিতর দিয়া আমাকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন,—হাঁ, একেই চাই। এই নিন চিঠিখানা—ধীরেশ বাবু আপনাকে দিয়েছেন।

কম্পিতহস্তে তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া খুলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে লেখা ছিল:—

মা, মিনু!

এই যে ছেলেটী তোমার বোর্ডিংয়ে চিঠি নিয়ে গিয়েছে, একে বোধ হয় তুমি চিনবে না; এ আমার প্রিয় ছাত্র ও বন্ধু শ্রীরণেনকুমার লাহিড়ী। চিঠি পাঠাচ্ছি এই কারণে—যে দুই এক-দিনের মধ্যেই তোমায় বোর্ডিং থেকে চলে আসতে হবে। কবে আসবে ব-লো, এ গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। এক

লজ্জা করবার কোন দরকার নেই। এ আমার ছেলের মতন, আমার শরীর মোটেই ভাল নয়, কেমন আছ লিখো, আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

তোমার বুড়ো-ছেলে—

শ্রীধীরেশচন্দ্র রায়

পিতা আর কেহ নয়, পিতা পাঠাইয়াছেন! এত অল্পকালের মধ্যেই যে প্রিয় বন্ধুগুলির স্নেহ ও প্রীতি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পত্রখানি মিস্ সেনের হাতে দিয়া বলিলাম,—বাবা লিখেছেন।

তাহার পর বেঞ্চের উপরে রণেন বাবুর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলাম,—সমস্ত মুখখানি তাঁহার লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

চিঠিখানি শেষ করিয়া, মিস্ সেন রণেন বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—তা হলে ওকে আজই নিয়ে যাচ্ছেন তো?

মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—ওঁর যা মত। বলেন ত আর একদিন এসেও নিয়ে যেতে পারি।

এত শীঘ্র যাইতে আমার মোটেই ইচ্ছা করিতেছিল না, তাঁহার দিকে তাকাইয়া কম্পিতস্বরে বলিলাম,—পরশু গেলেই যেন——

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মৃদু হাস্যের সহিত তিনি বলিলেন,—তা বেশ তো! পরশুই যাবেন! আমি তবে আসি।

হাত দুইটা তুলিয়া তাঁহাকে একটী নমস্কার করিলাম, তিনিও একটী প্রতিনমস্কার দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—তা হলে পরশু সব ঠিক করে রাখবেন, মোটর এনে নিয়ে যাব'খন।

তিনি চলিয়া গেলেন, বিমূঢ়ভাবে কতক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, মনে নাই; হঠাৎ পেছন হইতে কে বলিলেন,—কি মিনু,—বোর্ডিঙ ছাড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে, নয়?

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম,—বোর্ডিং-টিচার চারুদি!

তিনি বলিতে ছিলেন,—তা হবেই ত! এতদিন থাকলে একটা মায়া পড়ে যায় বৈকি! তা,উনি কে এসেছিলেন, মিনু?

বাবার এক ছাত্র, আমাদের বাড়ীতেই থাকেন।

ওঃ!

বইখাতা লইয়া যখন বোর্ডিংয়ে ফিরিলাম, ছুটীর পর তখন সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে! আমাকে দেখিয়া কুন্তলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল,—আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবি, ভাই?

লতিকা বোস একটু দূরে দাঁড়াইয়া মশারি ছাড়িতেছিল। হাসিয়া বলিল,—তা আর ছাড়বে না কেন!—আজকে কে এসেছিল, জিজ্ঞেস কর তো?

চক্ষু দুইটা—একটু রাগত করিয়া, তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—লতি,—ফের!

কুন্তলা আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল,—কে রে? লভার বুঝি, না তার বন্ধু টন্ধু কেউ?

প্রতিমা একটু গম্ভীরপ্রকৃতির মেয়ে, মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল,—মরণ আর কি! কি কথাই বললেন? বন্ধু-টন্ধু হ'লে কি আর মিস্ সেনের কাছে আমল পেতেন? ছাতুখোরেরাই তাকে—

সহসা মাধুরী বলিয়া উঠিল,—এই,...চুপ!

সকলে নীরব হইয়া গেল! দেখা গেল, বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেডেণ্ট মণিকা-দি একখানি বই হাতে করিয়া এদিকে আসিতেছেন। আমার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলি-লেন,—মিনতি,—তুমি নাকি বোর্ডিং ছেড়ে যাচ্ছ, শুনলুম,—মাটীর দিকে তাকাইয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম,—হু!

—কিন্তু বোর্ডিং তোমায় যদি না ছাড়ে?—হাসিতে হাসিতে তিনি নিজের রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

দুইটা দিন অক্লেশে—কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, কিছুই টের পাইলাম না। বিদায়ের দিন আসিল; বোর্ডিংয়ের মেয়েরা আজ সকলেই ব্যস্ত। কি করিয়া 'ফেয়ার-ওয়েল' দিলে আমার প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা অধিক দেখান হইবে, তাহা স্থির করিতেই ব্যস্ত।

বেলা দুইটার সময় কমন—রুমে মেয়েদের মিটিং বসিল,—শ্রীমতী কুন্তলা চাটার্জ্জি হইলেন সে সভার সভাপতি। প্রায় ত্রিশ চল্লিশটী মেয়ের সম্মুখে "বিদায়-অভিনন্দন" নামে একটী কবিতা পড়া হইল,—কুন্তলা একটী ফুলের মালা লইয়া ধীরে ধীরে

আমার গলায় পরাইয়া দিল! চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উঠিল।

বেলা চারিটার সময় বিছানাপত্র বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বোর্ডিংয়ের বাহিরে মোটরের শিঙা বাজিয়া উঠিল। কুন্তলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—ঐরে মিনু,—শোন! বাঁশী বাজল বুঝি! বিদায় লইয়া সকলের কাছে—গাড়ীতে গিয়া যখন উঠিলাম, কুন্তলা তখন কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—চিঠি লিখ্‌তে ভুলিস নি যেন ভাই,—বুঝলি?

উপরে বারান্দার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সকলের কাতর মলিন দৃষ্টি গুলি আমার দিকেই রহিয়াছে। ড্রাইভারের দিকে তাকাইয়া বলিয়া ফেলিলাম,—চালাও—জল্‌দি!

কি জানি, চোখ ভরাইয়া একটা অশ্রু উৎস যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছিল, দীর্ঘ তিন বৎসরের পরিচিত বোর্ডিংয়ের প্রত্যেক দ্রব্যটী যেন আমায় মায়ার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিস!…

দুই

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙ্গিল, খড়খড়ির ফাঁক দিয়া খানিকটা আলো ছিট্‌কাইয়া আসিয়া আমার বিছানার উপর পড়িয়াছিল; এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছি? মনে একটা লজ্জা আসিল।

আর ঘুমাইব না কেন? এখানে ত ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য কুন্তলা নাই।—বিছানায় বসিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতেছি. ঝি আসিয়া ডাকিল,—চা দোব, দিদিমণি!

চা? হাঁ তা দিয়ে যাও, আর মুখ ধোবার জলও একটু নিয়ে এসো ত ঝি!

এখানকার.. প্রত্যেক জিনিষই আমার কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছিল, অথচ মনে পড়ে—একদিন এই ঘরে মৃত্যুশয্যায় শুইয়াই অভাগিনী জননী আমার সংসারের প্রত্যেক দ্রব্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটাইয়া গিয়াছেন। একদিন এই ঘরের প্রতি ধূলিকণা প্রতিমুহূর্ত্তের চলা-ফেরা আমার কাছে কত প্রিয় ছিল, আজ আর তাহা নাই! কে-জানে আর কোনদিন সে অনাবিল সুখ-আস্বাদন পাইব কি-না!

—ওকি দিদিমণি, কাঁদছ কেনো গো!

ফিরিয়া দেখিলাম—চা হাতে করিয়া ঝি দাঁড়াইয়া! ঠোঁটের উপর জোর করিয়া খানিকটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম,—কৈ না, কাঁদিনি ত! চোখে কি একটা পড়েছিল, তাইতেই জল পড়ছে বোধ হয়।—হাঁ ঝি, তোমার নাম কি গা!

চা'টা সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া ঝি বলিল,—আমাকে মণির মা বলেই বাছা সকলে ডাকে।—অদেষ্ট দিদিমণি, অদেষ্ট। নইলে অতবড় মেয়েটা না-জ্বর, না-ব্যামো এমনি মরে যায়!—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল দিদিমণি!

রুদ্ধ আবেগ

চা-টা শেষ করিয়া ঘরের রুদ্ধ জানালাগুলি সব খুলিয়া দিতেছি, এমন সময়ে একটী ছয় সাত বছরের খুকী আসিয়া দুয়ারের পাশেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাকিলাম,—এস না খুকী, লজ্জা কি?—এস, পুতুল নেবে?

মেয়েটী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পুতুলের নাম শুনিয়া ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিলাম,—তোমার নাম কি খুকী?

নিতান্ত অপরাধীর মত আমার মুখের দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল,—মীলা।

—কোন্ বাড়ীতে থাক তোমরা?—

চুপ করিয়া সে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের এলাকায় নহে, তাহা বুঝিলাম; বলিলাম,—তোমার সঙ্গে আর কে কে এসেছেন?

মেয়েটী এবার উত্তর করিল,—দিদি!

সহসা বাহিরে দুয়ারের নিকট একটা চাপা-হাসির শব্দ শোনা গেল, মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম—আমারই সমবয়স্ক একটী মেয়ে।

বলিলাম,—ঘরে এসো না ভাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

মেয়েটী ধীরে ধীরে মুখে কাপড় দিয়া ঘরে ঢুকিল, 'মীলা' বেচারী আমার নিকট থাকিতে বোধ হয় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, দিদিকে ঘরে আসিতে দেখিয়া দিদির কোলের কাছে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

অল্পক্ষণ পরিচয়ের পর বুঝিলাম, মনীষারা আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকে, এমন কি এ বাড়ীতে যাওয়া-আসাও তাদের আছে। তবে আজ তাহারা আসিয়াছে—আমাকে দেখিতে!

মনীষা মেয়েটী মন্দ নয়, তবে-যা একটু বেশী রকমের লাজুক। মিশিবার ইচ্ছা আছে অথচ প্রাণ খুলিয়া মিশিতে সাহস করিতেছে না; যাইবার সময় তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলাম,—আবার আসবে ত ভাই? এসো—কেমন?

মনীষা বলিল,—এ কদিন আপনি কি—

'আপনি' কি, 'তুমি' বলতে হবে, বুঝলে?—আচ্ছা এস, দুপুরবেলা থাকব।

মনীষা মীরার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মীরা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—পুতু!

ওঃ! ঠিক বটে! আল্‌নার উপর হইতে একটী পুতুল পাড়িয়া তাহার হাতে দিলুম, কচি মুখখানি তাহার আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

স্নান করিয়া উঠিবার পর আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছি, একখানি মোটা বই হাতে লইয়া বাবা ঘরে ঢুকিলেন; গম্ভীর অথচ কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—ঘর বেশ পছন্দ হয়েছে ত মা? ওই একটা ঘড়ি রেখেছি—আলমারীতে বইগুলো দেখো যেন পরিষ্কার থাকে, পাশের ঘরে ঝি রইল, অসুবিধা হলে তাকে জানিও—ইত্যাদি

'বিবিধ প্রকার উপদেশ দিয়া তিনি শেষে বলিলেন,—বোর্ডিং থেকে চলে আসার দরুণ কষ্ট কিছু হয় নি ত ?

কষ্ট ? হাঁ হইয়াছিল বৈ কি ! দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া মাতৃহীন জীবনে—স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার যে স্বাদ পাইয়াছি, তাহাকে ভুলিব কি করিয়া ? ভুলিলেও যে তাহাতে অকৃতজ্ঞতার ভাগী হইতে হইবে, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম,—না কষ্ট আর কি বাবা? তবে পড়া শুনোর—

আমাকে একটু কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—তার জন্যে আর কি বল, মা? রণেনকে বলেছি, সেই কাল থেকে তোকে পড়াবে। কেমন তা হলে হবে ত—কি বলিস্ ?

কি জানি কেন সমস্ত মুখখানা আমার ঘামিয়া উঠিল, অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিলাম,—হবে।

ঝি আহারের জন্য ডাকিতে আসিল, বাবা বলিলেন,—রাঁধুনীকে বলগে—যাও ঝি, ও আমার সঙ্গে খাবে, বুঝলে ? আমারও ভাত দিতে বলগে।

ঝি চলিয়া গেল। বাবা বলিলেন,—আয় মা, খাবি আয় !

ধীরে ধীরে সঙ্কুচিতপদে তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।

তিন

শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর বাবার অনুমতি লইয়া আবার স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম; তবে বোর্ডিংয়ে নয়—এবার শুধু স্কুলে। কুন্তলা বলিল,—বাঁচালি ভাই, বাপ! এ কটা দিন যা করে কাটিয়েছি!

তাহার পরে আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল,—"মিনী, তোর তরে পথের পানে—আমি চেয়ে থাকি—"

প্রতিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—সং আর কি!

পড়া-শুনায় আবার মন বসাইলাম, প্রত্যহ সকালবেলা রণেন বাবু আমাকে পড়াইতে আসিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে—ইংরাজী বিদ্যায় তাঁহার মেধা ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া মাঝে মাঝে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। এত-ও মানুষে জানে!

'বাস'টা আসিয়া সেদিন এত চেঁচামেচি লাগাইয়াছিল যে কাণ দুইটা ঝালাপালা হইবার যোগাড়। বইগুলিকে কোনরূপে বগলদাবায় পুরিয়া তাড়াতাড়ি দুপ্ দাপ করিয়া বাসে উঠিতে যাইতেছি, হঠাৎ চোখ পড়িল—রণেন বাবুর উপর। রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া কি একখানা বই তিনি নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলেন,

রুদ্ধ আবেগ

আমি যাইতেই তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—স্কুল থেকে সেই অঙ্কগুলো আজ জেনে এসো ত মিনু! সবগুলো আজ কষে দেব।

অতগুলা মেয়ের সন্মুখে উত্তর দিতে আমার লজ্জা হইতেছিল যথেষ্ট। অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম,—আচ্ছা।

নিভা আমার পাশে একটু ঘেঁষিয়া বলিল,—উনি কে ভাই?

কোনরূপে আত্মদমন করিয়া বলিলাম,—কে—উনি? আমার সম্পর্কে দাদা হ'ন।

—আচ্ছা, কি দরকার ছিল বাপু, অতগুলি মেয়ের সন্মুখে অমন প্রশ্নটা করিবার? তাঁহার প্রতি মনটা আমার এত বিরক্ত হইল, কিন্তু কি করিব অতগুলি মেয়ের সন্মুখে!

স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম,—মনীষা তাহার ছোট বোনটীকে লইয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পেছন হইতে মীরাকে বলের মতন তুলিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলাম। মনীষাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল।

আহা বেচারীদের দেখিলে, সত্যসত্যই বড় দুঃখ হয়, ভগবান মানুষকে কেন যে এত গরীব করিয়া সৃষ্টি করেন, বুঝিলাম না, এ শাস্তি দিবার সময়ে মুহুর্ত্তের জন্যও কি তাঁহার দয়া হইল না?

"গরীবের হাতি রোগ" যেমন সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান সৃষ্টি করে, মনীষাদেরও ঠিক তেমনি করিয়াছে; শুধু দরিদ্র ন'ন, মত্তপ বলিয়াও মনীষার পিতার একটা দুর্নাম রটিয়াছে! আহা,

বেচারী মনীষার মায়ের হয়ত দুর্গতির সীমা নাই। স্বামী মাতাল—দারিদ্র্যের চেয়েও যে ইহা তীব্র অভিশাপ !

মনীষা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল,—মদ খেয়ে বাবা যখন মা-কে মারেন, তখন শুধু কেঁদে কেঁদেই ঘুমিয়ে পড়েন। কে-জানে বিশ্বে তাঁহার চেয়ে হতভাগিনী আর কেহ আছেন কি-না !

জুতা জামা খুলিয়া ফেলিতেই ঝি আসিয়া বলিল,—জলখাবার নিয়ে আসবেক দিদিমণি !

বলিলাম,—হাঁ নিয়ে এস, আর দু'থালা বেশী নিয়ে এসো বুঝলে। ঈষৎ রুষ্টমনে ঝি চলিয়া গেল; কে-জানে ইহাদিগকে খাও-য়াইয়াও আমার যেন কত সুখ হইত !

সন্ধ্যার সময় রণেন বাবু আবার ঘরে আসিয়া হাজির,—এনেছ মিনু, অঙ্কগুলো ? কই দেখি।—বলিয়া তিনি সন্মুখের চেয়ারখানিতে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন,—আন নি বুঝি সেগুলো ?—কই দেখি, হিষ্ট্রীখানা !

এ অযাচিত সাহার্য্য আমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সেল্ফ হইতে ইতিহাস খানা বাহির করিয়া দিলাম। কিন্তু তবুও তাঁহার স্নিগ্ধকণ্ঠস্বরের উপদেশপূর্ণ শিক্ষাগুলি অমৃতের মতই আমার অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল।

প্রায় আধঘণ্টা পড়াইবার পর হঠাৎ তিনি বলিলেন,—কা'ল বায়োস্কোপে যাবে মিনু ? চল, খুব ভাল বই আছে।

বায়োস্কোপ দেখিবার সখ আমার খুবই ছিল। ইচ্ছা হইতে-

ছিল বলি—কি বই হইবে। তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, নিজমনেই তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন—অনেকদিন পরে আবার 'মাতৃ স্নেহ' দিয়েছে। বাংলা বই,—যাবে মিনু ?

সত্যি, এই পুরুষগুলার কথা শুনিয়া ভারী হাসি পায়! কেন, কে-জানে! বায়োস্কোপে লইয়া যাইবার জন্য কোথায় আমাকে খোসামোদ করিতে হইবে—না তিনি নিজেই করিতে-ছেন! বলিলাম,—আর কে, কে, যাবেন ?

—তুমি আর আমি।—আর কে যাবে বল ?

না, না, তাহা কি হইতে পারে!···পরদিন দুপুরবেলা বাবাকে জানাইলাম।

—বেশ ত যাও না মা রন্তুর সঙ্গে। গাড়ীটা বার করে দিতে বলি ?

বাবার আদেশ লইয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য উপরে উঠিতেছি, সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রণেন বাবু! আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—কি, আর্জ্জি পেশ হোল ? চল, শিগ্‌গীর করে না-ও, বুঝলে।

বায়োস্কোপ আরম্ভ হইতে তখনও দেরী ছিল, সিঁড়িটার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ পিছনে কাঁধের উপর কাহার এক-খানি হাত পড়িল!

—এ কি কুন্তলা ? কুন্তলাও আমাকে দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল! বলিল,—কার সঙ্গে রে ?

কথাটা চাপা দিয়া বলিলাম,—তুই কার সঙ্গে, বল্ তো ?

কেন, ঐ তো দাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে! দাঁড়া, আলাপ করিয়ে দি।—

কুন্তলা চলিয়া গেল, আমি স্তম্ভিতের ন্যায় রেলিং ধরিয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কুন্তলার উপর মনে মনে এত রাগ হইতেছিল যে—

—এই যে দাদা, ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী মিনতি রায়, যার কথা তুমি বোধ হয় খুব কম করেও সাড়ে পঁচাশীবার শুনেছ।

তারপর আমার দিকে তাকাইয়া দুষ্টুমীপূর্ণ হাস্যে মুখ ভরাইয়া বলিল,—এই দেখ, মিনী, ইনি আমার দাদা শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ—বুঝলি?

কুন্তীর উপর ভয়ানক রাগ হইতেছিল সত্য, তবু সভ্যতার খাতিরে হাত দুইটী কপালে তুলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম,—নমস্কার।

অরুণ বাবুও হাত দুইটা তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

বেশ সরল, সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট চেহারা। বাংলার প্রতি সন্তান-ই যদি এরূপ স্বাস্থ্য পাইত—

কুন্তলা হাসিয়া বলিল;—গল্প যে তোদের আর ফুরোয় না-রে মিনী! ঘণ্টা পড়ে গেছে শুনেছিস্?

সত্য-ই ত, আলাপ পরিচয়ে আমরা দুজনেই এত নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম যে ওয়ার্ণিং বেলের শব্দ মোটেই শুনিতে পাই নাই, বিদায়-নমস্কার লইয়া উপরে উঠিতেছি, হঠাৎ চোখ পড়িল নীচে—রণেন বাবুর উপর, মুখখানি তাঁহার ভারী গম্ভীর—নীরস!

চার

"—মলিন কালো ধুইয়ে ফেলে
"—ঢাললে তরুণ আলো,
অসীম পারের বন্ধু ওগো
বাস্‌বো তোমায় ভালো।"

সমস্ত অন্তরটা সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই কেমন মুষরিয়া গেল। যেন কোন সুদূর অতীতের একটা অস্পষ্ট ব্যথা-পূর্ণ স্মৃতি আবার বুকের মধ্যে জমিয়া উঠিয়াছে।

অরুণ বাবু—বেশ সুন্দর কমনীয় তাঁহার আকৃতি, কে-জানে তাঁহার অন্তরতর অন্তরতম প্রকৃতিটীও বাহিরের মত ঠিক এমনি স্বচ্ছ নির্ম্মল কি-না। বেশ নম্র ব্যবহার, যতবারই কাল কথা কহিতেছিলেন, লজ্জায় মাথাটী তাঁহার নুইয়া পড়িয়াছিল, বিদায়ের সময় একবার স্পষ্ট ও দীপ্তভাবে আমার মুখের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন, সে দৃষ্টিতে যেন একটা কমনীয়তা, একটা ভাষা লুকাইয়াছিল। আমায় শেষে সত্যসত্যই বলিয়া ফেলিলেন,—যদি কিছু না মনে করেন ত আমাদের বাড়ীতে একবার যেতে অনুরোধ করি! কী মিষ্ট অনুরোধ। কথাবার্ত্তায় দু'জনে এত নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম যে ওয়ার্ণিং বেল্ আমাদের কাণে মোটেই পৌঁছায় নাই।

কুন্তলাকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে, সে-ই না আমায় এমন অপ্রস্তুত করিল ?

বায়োস্কোপ দেখিয়া মনটা এত খারাপ হইয়াছিল যে, কাল রাতে বাবার একান্ত অনুরোধেও কিছু মুখে দিতে পারি নাই।

পুরুষদের মন কি এতই স্বার্থপর ? এত হীন ? ছি ! অভিমানী বিবাহিতা পত্নীর অজ্ঞাতসারে আর একটী অভাগিনীকে জমিদার-পুত্র যদি বিবাহই করিল, তাহার পরিচয় দিতে পত্নীর নিকট এত আশঙ্কা ! আপনার পুত্র বলিয়া অভাগিনীর পুত্রকে পরিচিত করিতেও লজ্জা করিল ? হায় রে ভালবাসা !

যাক্ ছাই, কি হইবে ওসব ভাবিয়া ! মনটী যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

—কিরে মীনু, এখনও ঘুম থেকে উঠিস্ নি ? অসুখ-বিসুখ করেছে না কি, দেখি ?—বাবা ঘরে ঢুকিলেন ; মাথাটা তাঁহার কোলের কাছে আরও টানিয়া লইলেন।

কৈ না, আমার অসুখ ত আদৌ করেনি বাবা. আমি এমনি শুয়েছিলুম।

বায়োস্কোপ কেমন দেখ্‌লি মা ! ভাল লাগেনি বুঝি ?

অন্য অন্য দিন 'বাসের' হতভাগা কোচমানের স্বর নয়টার আগেই বাড়ী কাঁপাইয়া দিত, আজ যে এখনও কেন আসিতেছে না, বুঝিলাম না। ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, নয়টা বাজিতে তখনও আধ ঘণ্টা দেরী। পোড়া কাঁটা কি চলিতে চাহে না ? বাবা চলিয়া

যাইবার পর আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া, চুলগুলি গুছাইয়া লইয়া, বইগুলি সাজাইতেছি, রণেন বাবু ঘরে ঢুকিলেন।

কি মীনু, বই সাজাচ্ছ যে! খাবে না?

তাঁহার কথাগুলি আমি যেন আদৌ শুনিতে পাই নাই, এমনি ভাণ করিয়া বই গুছাইতেই লাগিলাম। ঝি আসিয়া ডাকিল—খাবে না দিদিমণি, বেলা হয়ে গেল যে!

একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম—না, বল্‌গে যা, আজ খাব না, শরীর খারাপ।

ঝি চলিয়া গেল। দেরাজের উপর হইতে বায়োস্কোপের হ্যাণ্ড-বিলটা নাড়িতে নাড়িতে রণেনবাবু বলিলেন—কি ক'রে শরীর খারাপ হলো মীনু?—তা হোক, তুমি দুটী খেয়ে নাও, বুঝ্‌লে?

নীচে সহিস হাঁকিয়া উঠিল। বইগুলি লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছি, রণেনবাবু দুয়ার আট্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন।

—লক্ষ্মীটী মীনু, যা হোক দুটী খেয়ে নাও, শুন্‌বে না?

একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে—

তা, ও-বরং চলে যাক্, মোটরে যেও—বলিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—দিদি-বাবু মোটরমে যায়েগা, তোম যানে শেক্‌তা!

তাঁহার উপর শুধু যে রাগ হইল, তাহা নহে; মনে মনে হাসিও পাইল। আমাকে এরূপ অযাচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে খাওয়াইবার এই অদম্য আগ্রহের কারণ কিছু বুঝিলাম না। কোনরূপে দুই চারি-

খানা লুচি খাইয়া হাত ধুইতেছি, এমন সময়ে ঝি আসিয়া বলিল—তোমাদের মটর-কারের বাবুর অসুখ লেগেছে, বল্‌লে, গাড়ী বেরুবে না!

উপায়! এত রাগ ধরিতেছিল রণেনবাবুর উপর, কি করিব—তাঁহার জন্যই তো আমার এই অবস্থা! রাগ করিয়া উপোষ থাকাও হইল না, আবার স্কুল যাওয়াও হইল না। বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িলাম, চোখ ফাটিয়া আমার জল আসিতেছিল।

মীনু!

চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—রণেনবাবু!

চল স্কুলে।—আবার শুয়ে পড়লে কেন? অসুখ কর্‌ছে বুঝি? আচ্ছা থাক, তাহলে গাড়ী আবার রেখে আসি।

ইচ্ছা হইতেছিল চেঁচাইয়া বলি—না গো না, অসুখ আমার মোটেই করে নাই—সেজন্যে তোমার অত মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই।

বলিলাম—না, অসুখ ত করে নি—তবে ড্রাইভারের অসুখ করেছে।

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—তার আর কি হয়েছে, চলো না, আমি-ই নিয়ে যাচ্ছি।

ভয়ানক লজ্জা করিতেছিল আমার। একদল মেয়ের সম্মুখে—তার চেয়ে না যাওয়াও বোধ হয় ভাল ছিল, কি ভাবিয়া আবার যাইতে ইচ্ছা হইল, বলিলাম, আচ্ছা, চলুন।

নীচে নামিয়াই বিস্মিত হইলাম। এ টু-সীটার মোটর কাহার? রণেনবাবু ষ্টার্ট লাগাইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, উঠে পড়! তাঁহার পাশে নিতান্ত জড়সড়ভাবে বসিয়া পড়িলাম!

স্কুলে পৌঁছিতেই দেখিলাম, স্কুলে আসিতে আধঘণ্টা দেরী হইয়াছে এবং সহসা স্কুলে ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস আসার দরুণ সেদিনকার মত ছুটী হইয়া গিয়াছে। কুন্তলা বলিল—কি বরাত ভাই, পোইট্রীটা আজ মোটেই মুখস্থ হয়নি—আর আজকেই কি-না ইনস্‌পেক্টার এসে হাজির! হাঁ রে, আমাদের বাড়ী কবে যাবি? নেমন্তন্ন নিয়েছিস, রাখ্‌তে যাবি না?

—তুই এখন বোর্ডিঙে, না বাড়ীতে রে?

কুন্তলা একটু হাসিয়া বলিল—এখন ভাই এক মাস ছুটী নিয়ে বাড়ীতেই আছি।

দীপ্তি ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিয়া লইয়া বলিল—জানিস্ না বুঝি, এবার ওর কি হবে!

আগ্রহভরে কুন্তলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম—কি হবে রে কুন্তী?

কুন্তলা মুখ ফিরাইয়া বিরক্তভাবে বলিল—শ্রাদ্ধ হবে!

স্কুল হইতে ফিরিয়া ভাবিলাম, এবার ও-বেলাকার শোধটা তুলিয়া লইতে হইবে। বড় যে আগ্রহভরে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠান হইয়াছিল। এবার? দরজায় খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহাতেও কি ছাই নিষ্কৃতি আছে! ঝি-ঠাকুরাণী আসিয়া জল-

খাবারের জন্য দোরের কাছে দাঁড়াইয়া এমন চেঁচামেচি সুরু করিল যে, না উঠিয়া উপায় নাই। জলখাবারের থালাটা তাহার হাত হইতে লইয়া আবার খিল দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কুন্তলার কথা সত্য কি? অরুণবাবুর নিকট হইতে যে নিমন্ত্রণ মৌনভাবে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে হইবে বই কি! কৈ; মুখ ফুটিয়া সে সময় তো কোঁন ওজর দেখাইতে পারিলাম না। সে সময় এ অযাচিত সাদর আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোন ভাব ফুটাইতে পারিলাম না ত,—হাসিমুখে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন ঘুম আসিল, রাত্রি তখন প্রায় দশটা। বাবা বাহিরে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন—খবরদার, আজ তোরা কেউ দিদিমণিকে বিরক্ত করিসনি শরীর খারাপ—বুঝ্‌লি?

পাঁচ

"শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউএর মতন ভাষা বাঁধন-হারা—
আমার সেই রাগিণী শুন্‌বে নীরব হেসে।"

সন্ধ্যার কাল-ছায়া তখনও ধরণীর বুকে ঠিক জুড়িয়া বসে নাই। শুইবার ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া 'মানসী'র পাতা উল্টাইতে ছিলাম। বাড়ীতে আর কেহই নাই। বাবা ছাদের ঘরটীতে

নিজের বিছানায় শুইয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। সমস্ত দিনটা অর্গান্ বাজাইয়া আর হিষ্ট্রীর বংশাবলী ধ্বংস করিয়া রণেনবাবু সবেমাত্র সান্ধ্য-ভ্রমণটা সারিয়া লইতে গিয়াছেন। অবশ্য আমাকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিতে কসুর করেন নাই, তবে শরীরের অবস্থা নিতান্ত খারাপ বলিয়া সে অনুরোধ হইতে রেহাই পাইয়াছি, এই যা!

পুরুষ-মানুষ জাতটাকে চিনিয়া লওয়ার চেয়ে শক্ত কাজ বোধ হয় আর দুনিয়ায় নাই। অন্তরের আকাঙ্খা প্রীতি তাহাদের মুক্ত প্রাণের মধ্যে কখন আধিপত্য ছড়াইয়া বসে, আবার কখন সেই প্রীতি স্নেহের উপর একটী মলিন দাগ বসাইয়া চলিয়া যায়,—বোঝা অত্যন্ত দুরূহ। তাহাদের অন্তর,—তাহাদের ভালবাসাও—

মীনু!

কে, কুন্তলা?—তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দেখিলাম, কুন্তলা আসিয়া হাজির!

অন্ধকারে ব'সে কি ভাব্‌ছিলি রে?

তোর কথা।

আমার, না—আর একজনের?

কুন্তলার গাল দুইটী টিপিয়া দিয়া বলিলাম—হাঁ, এই লোকটীর।

কুন্তলা বলিল, নে নে, কাপড় ছাড়; না, এই কাপড়েই যাবি?

স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম—কোথা রে?

আহা, তা যেন জানেন না। আমাদের বাড়ী,—নে, চল ভাই শীগ্‌গীর, দাদা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

চমকিয়া উঠিলাম।—কে এসেছেন বল্‌লি ?

কুন্তলা ব্যস্তভাবে বলিল—দাদা রে, দাদা,—একটু শীগ্‌গীর ক'রে নে ভাই !

বাবাকে বলিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তা যা তরে, একটু শীগ্‌গীর ফিরিস্ বুঝ্‌লি ?—আর হাঁ, রণেন এসেছে কি ?

না, আসেন নি এখোনো।

কাপড় জামা পরিয়া, নীচে নামিতেই অরুণবাবু হাত দুইটি তুলিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—নমস্কার।

লজ্জায় সমস্ত মুখখানা আমার ঘামিয়া উঠিয়াছিল। হাত দুইটা তুলিয়া আমিও একটি প্রতি-নমস্কার দিলাম। গাড়ীতে ষ্টার্ট লাগাইয়া অরুণ বাবু নিজেই ষ্টিয়ারিং ধরিলেন।

কুন্তলার মা আসিয়া কত আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। একটা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা আসিয়া আমার সমস্ত শরীরকে এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে, কথাগুলি সব আমার জিহ্বার নিকটে আসিয়াই আটকাইয়া যাইতেছিল। কুন্তলার বড় বৌ-দি' সহসা আমার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—এস ত ভাই আমার সঙ্গে !

ঘরটীতে ঢুকিয়া দেখি, একদল মেয়ে বসিয়া। কাহারও হাতে এস্রাজ, কাহারও হাতে বীণা ইত্যাদি এক এক রকম যন্ত্র। কুন্তলার বৌদিদির সহিত ঘরটীতে ঢুকিতেই—ঘরখানি যেন একেবারে নিঝুম হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিশ জোড়া চক্ষু আমার মুখের উপর আসিয়া

পড়িল। বৌদিদি বলিলেন—আজ ইনি তোমাদের সঙ্গীত-সভার সভাপতি হবেন ; বুঝলে সব ?

চারিদিক হইতে আনন্দ-কলরোল উঠিল। আর আমার অবস্থা? কুন্তলার উপর যে ক্রোধ হইতেছিল, তাহাকে সন্মুখে পাইলে তৎক্ষণাৎ বোধ হয় তাহার একটা পরিচয় হইয়া যাইত।

বৌদিদির হাত দুইটা ধরিয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বলিলাম—দোহাই বৌদি' এসব বিষয়ে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, তা বটে, প্রাইজের সময় গানে আর বাজনায় ফাষ্ট´-প্রাইজটা ও-পাড়ার বুচি খেঁদী পেয়েছিল নয়?—দুষ্টু, গাও বল্‌ছি এখনি?

কিন্তু শরীরটে আজকে—

—ওসব লেম্ একস্‌কিউজ আজকে চল্‌বে না ত মিস্ রায়?

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—অরুণবাবু একটি এস্‌রাজ লইয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া।

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আবার সেইরূপ বিনয়নম্রবচনে—স্নিগ্ধস্বরে তিনি বলিলেন—না না, ওসব কথা রাখুন, আজকে অন্ততঃপক্ষে একটা গান আপনাকে গাইতেই হবে। দেখ্‌ছেন ত এত-গুলি শ্রোতা আপনার অপেক্ষায় কি রকম বসে রয়েছে।

জীবনে এরূপ বিপদে কখন পড়ি নাই; একি মহা ধাঁধায় আজ পড়িলাম! একধারে অন্তরের সমস্ত লজ্জা কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ আসিয়া নিবিড়ভাবে জমাট বাঁধিয়াছে, আর এক দিকে অরুণবাবুর মিনতিপূর্ণ

অনুরোধ—শ্রোতাবন্ধুদিগের একটা প্রবল আগ্রহ—প্রতীক্ষা! অরুণ বাবুর অনুরোধ,

—কৈ গো, তোরা খেতে এলি নি সব? আয় আয়, ওলো কুন্তী, তোর বন্ধুটীকে নিয়ে আয় না লো?

বাপ্, বাঁচা গেল। কুন্তলার ঠাকুরমা আসিয়া আমাকে এক মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। নহিলে ইহাদের সম্মুখে গান ধরিলে—

অরুণবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন—আমি, কুন্তী আর ইনি এর পরে খাব ঠাকুরমা, এখন ওদের খাওয়াওগে যাও।

অরুণ বাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আপনি ভাব্লেন যে, খুব নিস্কৃতি পেয়েছি, নয়? কিন্তু আমার মত লোকের হাতে প'ড়ে আজ আপনাকে একটু বেগ পেতে হচ্ছে। নিন, এইবার একটা ধরুন, সব চলে গেছে।

অস্ফুটস্বরে বলিলাম, কি ধর্বো বলুন? গলা আমার আজ মোটেই ভাল নেই কিন্তু।

প্রকাণ্ড হল্টার মধ্যে আমরা তখন তিনজন। বিজলী-বাতির খানিকটে আলো ঠিক্রাইয়া আসিয়া অরুণবাবুর মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে আলোতে তাঁহার দেবতার মত প্রশান্ত সুন্দরমুখখানি আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে একখানি গান আরম্ভ করিলাম; অরুণবাবু অর্গানটার উপর বসিয়া বাজাইতে সুরু করিলেন—

রাত্রি এসে যেথায় মিশে দিনের পারাবারে।
তোমায় আমায় দেখা হ'ল—সেই মোহানার ধারে॥

অর্গানের সুর ঘর হইতে বাহিরে ছুটিল, শেষে বায়ু হইতে অসীমের চারিধারে ছড়াইয়া কানের মধ্যে ঝঙ্কার তুলিল। বায়োস্কোপের ছবির মত, চাঁপাফুলের মত শ্বেতশুভ্র তাঁহার অঙ্গুলীগুলি রীডের উপর নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর সে সুরের ঝঙ্কার কানের মধ্যে ঢুকিয়া সমস্ত অন্তরকে আকুল করিয়া তুলিল। আমার ঘর্ম্মসিক্ত মুখের পানে তাকাইয়া তিনি বাজাইয়া চলিলেন—

মুখের পানে তাকা'তে যাই, দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই।

স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা, কাঁদি আকুল ধারে।

ওগো, একি আকুলতা, একি মর্ম্ম-কাঁপান সুর! থামাও থামাও তোমার ও-সুর, ওগো মত্ত পথিক! অন্তরের নিভৃত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে একি বিশৃঙ্খলতা, একি বিদ্রোহ-তরঙ্গ খেলিয়া গেল! এখনও সেই সুর, সেই ঝঙ্কার আমার গোপন-চিত্তের প্রতি-বিন্দুটীকে নাচাইয়া তুলিতেছে! ওগো গোপন পথিক! একি আকুলতা আমার শান্ত স্থির প্রাণে তুমি জাগাইয়া দিলে?

—ও কি, কাঁদ্‌ছেন না কি?

সত্যই তো, এ আমি কি করিতেছি! পোড়া রুদ্ধ-অশ্রু যে আর বেগ মানিতে চাহে না।

কুন্তলা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, কাঁদবে না! যে ভাবে বাজিয়ে তুমি ওর গানের রসটুকু নষ্ট করে দিচ্ছিলে দাদা, আমি হলে ত চেঁচাতুম।

আমার দিকে তাকাইয়া অরুণবাবু বলিলেন, সত্যি, বাজান খুব

খারাপ হয়েছে নয়? সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার মন ছিল আপনার গানের দিকে, আঙ্গুলগুলো কেবল বাজিয়ে গেছে।

বাধা দিয়া বলিলাম, কৈ না, বেশ ত' বাজানো হয়েছে! চোখে কি একটা—

আচ্ছা উঠুন, এবার খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্‌।

যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা; নিজের টু-সীটার কারের পার্শ্বে সযত্নে বসাইয়া, তিনি আমায় বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। উদ্দাম চঞ্চল-প্রাণের মধ্য হইতে কাহার সুন্দর মূর্ত্তিখানি মাঝে মাঝে আমার দীপ্তিহারা চক্ষের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

অনেক রাত্রি অবধি বিনিদ্র-অবস্থায় শত সহস্র চিন্তার জালে আবদ্ধ থাকিয়া, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, মনে নাই।

ছয়

একটা দুঃস্বপ্নের মতই কালকের রাত্রের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। অতগুলি মেয়ে, যাহারা আমার গান শুনিবার জন্য অত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়াছিল, না জানি তাহারা কি ভাবিল! হয় ত আমার বিষয় গল্প করাই—আমার শিক্ষা-দীক্ষার—দূর ছাই, এ সব কি চিন্তা মনের মধ্যে আসিতেছে! অরুণবাবু! হাঁ, একজন নম্র বিনয়ী যুবক বটে! বড় হইতে ছোটটীকে পর্য্যন্ত কেমন আপনি বলিয়া কথা কহা!

কিন্তু তাঁহার কাছেও কাল কত অপরাধ করিয়াছি! কুন্তলার বৌদিদির উপর কাল প্রথমে এত রাগ হইতেছিল—কি বলিব! কেন বাপু! সঙ্গীতচর্চ্চায় ফার্ষ্ট হইয়া প্রাইজ পাই বলিয়াই কি যেখানে সঙ্গীত-সভা ব'সে, সেখানে আমাকে সভাপতি হইতে হইবে? কেন কুন্তলাকে সভাপতি করিলে ত পারিতেন। সে-ও ত বৎসরের পর বৎসর সম্মানের সহিত সঙ্গীত-শিক্ষায় দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়া আসিতেছে!

রণেনবাবুর মন আজকাল এত বিমর্ষ কেন, কে জানে? কুন্তলার দাদার সহিত আলাপ করার দরুণই কি তাঁহার মন এত তিক্ত—এত বিরস? জীবনের অন্তরাত্মার বিকাশ যেস্থানে পরিস্ফুট—

মিনতি?

চমকিয়া উঠিয়া পেছন ফিরিয়া দেখি, রণেনবাবু!

আসুন, ঘরে আসুন!

আজ স্কুলে যাবে না মিনু?

এই ত আবার সেই স্নেহের ডাক! তবে এ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ 'মিনতি বলিয়া ডাকা কি পরিহাস, না বিদ্রূপ?

বলিলাম—না, শরীরটে আজ মোটেই ভাল নেই। বোধ হয় যাব না।

রণেনবাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন—সময় কাল যা খারাপ পড়েছে, বল্‌লেও ত তোমরা শোন না, কাল অত রাত পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে আসাটা কি ভাল হয়েছে?

অনাবৃত পৃষ্ঠের উপর কে যেন একগাছা লক্‌লকে চাবুক মারিল। সমস্ত শরীরটা সেই একটী কথায় শির্ শির্ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলাম—নিমন্ত্রণে গেলে সকলেই কাটিয়ে আসে—কিন্তু সে জন্যে দোষ কাকেও দেওয়া যায় না।

মোটা বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তিনি বলিলেন—দোষ দেওয়া যায় না ব'লে স্বেচ্ছায় একটা কষ্টকে বরণ ক'রে নেওয়াও ত ঠিক নয়! আর লোকের চোখেও সেটা ভাল দেখায় না। যাক্ আজ তাহলে তুমি পড়্‌বে না?

অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম—না।

বুঝিলাম না, কিসের জন্য ধীরে ধীরে এ বিদ্রোহের সৃষ্টি তিনি নির্ভীক অম্লান চিত্তে করিয়া যাইতেছেন।

এক কাপ চা দে ত মিনু!—বাবা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন।

কি রনু যে! পাগলীকে পড়াচ্ছিলে বুঝি?

আমার দিকে একটী কঠোর দৃঢ়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রণেনবাবু উত্তর দিলেন—না, আজকে মিনতি বল্‌ছে, পড়্‌বে না, শরীর খারাপ!

ষ্টোভের উপর জল বসাইয়া কনডেনসের মুখ খুলিতেছি, বাবা বলিলেন—শরীরটে কি বড়ই খারাপ লাগ্‌ছে মিনু?

না বাবা, তেমন কিছুই নয়।

দেখিস্ মা, সাবধানে থাকিস্। হাঁ, কাল রাতে কখন ফির্‌লি মা? উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রণেনবাবু বলিলেন—তা রাত প্রায় একটা হবে।

তুমিও গিছ্‌লে না কি হে?

বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—আজ্ঞে না, তখন নীচে ঘরে আমি পড়্‌ছিলুম্‌!

ইস্‌! কি প্রবঞ্চনাময় কুটীল হৃদয় এই পুরুষ-জাতিটার! শুধু একটা জেদ এবং আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আমার প্রতি কি ব্যবহারই না করিতেছেন! কিন্তু 'অরুণবাবু? কৈ, তাঁহার শরীরে এই নীচ কুসংস্কারের চিহ্নও ত পাইলাম না! দেবতার মত নির্ম্মল তাঁহার চরিত্র, পুষ্পের মত শুভ্র তাঁহার আকাঙ্খা, আবার সিংহের মত নির্ভীক তাঁহার ব্যবহার!

মিনু! মা-আমার!

পেছনে ফিরিয়া দেখিলাম, রণেনবাবু নাই, বাবা একা।

জানিস্‌ত মিনু, আমার একটী বাসনা আছে, যার জন্যে তোকে বোর্ডিং থেকে বাড়ীতে এনেছি!

বিস্মিত স্তম্ভিতনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম, কি বাবা!

অন্তরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি আমার যেন শিথিল হইয়া গেল, না-জানি এবার কি কথাই না শুনিতে হইবে! বাবা বলিতেছিলেন—আর তোর মারও ইচ্ছে ছিল মীনু, যে একটী বেশ সচ্চরিত্র-শিক্ষিত ছেলের হাতে তোকে সঁপে দি! অমত করিস্‌নি মা! রণেন বলেছে—

বাধা দিয়া একটু শক্ত হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—কি বলেছে বাবা?

তোর মনকে সে জয় করেছে! আর তুইও তাকে—

মিথ্যা কথা! জীবনের মধ্যে যদি কাহাকেও আমি অন্তরের সহিত ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম—যদি কাহাকেও জগতের মধ্যে হেয় নীচ পদার্থ বলিয়া জানিতাম, তবে সে এই হীন মিথ্যাবাদী জাতিটাকে! লুণ্ঠনকারী দস্যুকে ভালবাসি—অত্যাচারীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারি, কারণ তাহারা বুঝিতে পারে না, কি সর্ব্বনাশ তাহারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অপ্রতিহতভাবে জগতের বুকে করিয়া চলিয়াছে! কিন্তু এই মিথ্যাবাদী? জানিয়া শুনিয়াও শুধু মুহূর্ত্তের একটা সাফল্য-ভরা আলোকের রশ্মিতে নিজেদের বিবেক-পূর্ণ চক্ষু ধাঁধাইয়া লয়। পৃথিবীর অভিশপ্ত জীব—

মীনু!

চোখ ফাটিয়া আমার জল আসিতে চাহিতেছিল, বাবার কোলের উপর মাথা রাখিয়া সেইখানেই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে তখন উত্তপ্ত সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল—আর অন্তরে আমার সমস্ত জমাট-বাঁধা অভিমানটুকু জল হইয়া চক্ষু দিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছিল!

স্নেহনিষিক্তকণ্ঠে বাবা আবার ডাকিলেন—মীনু, মা আমার!

কোলের উপর মাথা রাখিয়াই বলিলাম কি বাবা!

তোর মা'কে মনে পড়ে রে?

মা'কে! জীবনের সুখ-দুঃখমিশ্রিত সমস্ত স্মৃতিগুলা নির্ম্মমভাবে কেউ হৃদয়পট হইতে মুছাইয়া দিলেও অভাগিনী মায়ের স্মৃতিটুকু

উজ্জ্বল দেউটীর মতই জ্বল জ্বল্ করিতে থাকিবে! সেই সুন্দর মুখ-খানি—সেই সুন্দর কোমল দৃষ্টি; সেই আহ্বান—এ জীবনে তাহা চির-উজ্জ্বল হইয়া—চির পরিস্ফুট হইয়া আমার চোখের সুমুখে জ্বলিতে থাকিবে! হউক না সে অতীতের কথা, হউক না সে পুরাতন—ওগো, তবু সে আমার এ ব্যথিত জীবনে চির নূতন, চির-বর্ত্তমান!

কাঁদিস্ নি মা, আজ তারই একটা বাসনা তোকে পূরণ কর্তে হবে! তুই বিয়ে কর্বি, সুখী হবি, এ যে তার বড় ইচ্ছে ছিল মা? বল, রণেনকে তা হলে মত দি?

হে আত্মার কাম্য-দেবতা, ওগো জগদীশ্বর, এ কি মহা-পরীক্ষায় আজ আমায় ফেলিলে! নিষ্কলঙ্ক শুভ্র-দেবতা আমার—

মীনু! কি, আমার দিকে অমন ক'রে চাইছিস যে?—আচ্ছা, ভেবে দেখ্ মা! তবে জানিস্, এ বুড়ো ছেলের আশীর্ব্বাদ তোদের চিরকাল অমর ক'রে রাখ্তে চাইবে! চল মা, স্নান ক'রে আসি!

ওগো নিভৃত অন্তরের পূজ্য দেবতা আমার! দেখাও, দেখাও আজ তোমার পুণ্য-আলোক, এ অন্ধকারে আর যে থাক্তে ইচ্ছে কর্ছে না আমার!

সাত

আঁধার-ভরা উদ্বেগ-বিহীন পথের মাঝে সঙ্গীহারা জীবনখানি লইয়া দাঁড়াইয়া—এ কাহার আলোকোজ্জ্বল সবিতার ন্যায় দীপ্তমূর্ত্তি দেখিলাম! নির্জ্জীব জীবনে, শান্তিহারা ভাবে, অনাদৃত—লাঞ্ছিত এ দগ্ধ-পরাণ লইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ওগো, কে তুমি, তোমার সরস বলপূর্ণ স্নিগ্ধ-কোমলস্বরে আমায় আশ্বাস দিয়া গেলে? একি বারি-বিহীন ধূ ধূ মরুভূর বুকে অতৃপ্ত পিপাসা জাগাইয়া, সুন্দর তুমি শীতল বারি লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া! আঃ, আজ বোধ হয় আমার নিষ্কৃতির দিন—চিরবিদায়ের দিন! উদ্বেলপূর্ণ, শত বাধা-বিপত্তিপূর্ণ উর্ব্বর ভূমিখণ্ড হইতে আজ চলিয়াছি সরল কোমল সত্যের পথে—পবিত্রতার পথে!

"মীনু!"

"কে, অরুণবাবু?—না না, রণেনবাবু? আঃ!"

"কেমন আছ মিনতি?"

একি! এখনও আমার রোগ-কাতর মুখখানি আপনার ক্রোড়ে লইয়া রণেনবাবু বসিয়া আছেন? এ কি ভালবাসা?—প্রেম?—না, বলিতেও যাহা ঘৃণা হয়, ভাবিতেও যাহা শরীর শিহরিয়া উঠে, সেই চঞ্চল আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা!

"কেমন আছি, কে জানে! সেই যে সন্ধ্যার সময় শুইয়া পড়িয়াছি

তার পর আর উঠিবার শক্তি পাই নাই, একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া, তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, আমায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে ;—শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছি।"

বাবা আসিলেন !—'মীনু, কেমন আছিস্ মা ?"

একি দুর্ব্বলতা আসিয়া আমায় ছাইয়া ফেলিল,—কথা কহিবার শক্তিটীও ত কৈ খুঁজিয়া পাইতেছি না !

"একটু 'হাঁ' কর ত মীনু।"

"কে, রণেনবাবু ! হাঁ, দিন্। আঃ !"

জীবনের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছিলাম, আজ সে-ই ত সমস্ত রাত্রি অনাহারে—অনিদ্রায় আমারই শুশ্রূষায় কাটাইয়া দিল ! তবে ? একি শুধু মুহূর্ত্তের ভূল—ক্ষণিকের উত্তেজনা !

"রণেনবাবু !"

আমার মাথাটীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রণেনবাবু বলিলেন—"কেন মীনু ? এই ত আমি এখানে আছি ! বল, কোন কষ্ট হচ্ছে কি ?"

ইস ! কি কোমল, কি স্নিগ্ধ সুরেই না কথা কয়টী আমার কাণে আসিয়া বাজিল ! যে মলিনতা দেখিয়া ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর শিহ-রিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা কি সুন্দরভাবেই না রাঙাইয়া উঠিল !

"দোয়াত আর একটুক্‌রো কাগজ, রণেনবাবু !"

কিন্তু কি লিখিব ? আসিতে ? যদি না আইসে ?—না না,

আসিবে বই কি! কুন্তলা, কুন্তলা—তাহাকে যে আমি জীবন ভরিয়া ভালবাসি! আমার অসুখ শুনিলে সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে? দূর ছাই, কলম সরিতে চাহে না কেন? যত জোর করিয়া কলম ধরিতে যাই, কে যেন তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সে-চলা ব্যর্থ করিয়া দেয়! অনেক কষ্টে লিখিলাম—

ভাই কুন্তী!

কোন্ অদৃশ্য সত্য-সুন্দরের স্নেহসিক্ত আহ্বানের জন্য আজ বিশ্ব ছাড়িয়া—জগতের প্রত্যেক রেণু পরমাণুটী ছাড়িয়া, মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছি, জানি না! এ আহ্বান শুধু আজ নয়—কত যুগ যুগান্তর হইতে আমারই মত কত অভাগিনীকে বরণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমিও চলিলাম, আমারও ডাক আসিয়াছে! ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া যে গোপন-সুখ নীরবে আপনি ফুটিয়া উঠে, সে সুখ আজ আমিও পাইয়াছি। বিদায় কালের শেষ দেখা দিতে আজ তোকে তাই আহ্বান করিতেছি! তোরই আশায়—তোরই অপেক্ষায় এখনও এ মহা-নিদ্রার হাত এড়াইয়া জাগিয়া আছি! বিদায়, বিদায় বন্ধু!

ইতি তোরই—
মিনতি!

সত্যই কি আমার মাথা খারাপ হইয়াছে? এ সব ছাই ভস্ম যা-তা কি লিখিলাম! বেহারা!

অরুণবাবু কি কুন্তলার সহিত আসিবেন? ছিঃ, তাঁহার চিন্তা,

তাঁহার ধ্যান, তাঁহার কল্পনা করাও যে আজ আমার পক্ষে মহাপাপ! দেবতার পূজা করা কাঙালিনীর পক্ষে কতখানি পাপ, তাহা সে নিজেই কি জানে?

"বেহারা এসে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মীনু!"

"হাঁ, এইখানা নিয়ে যাও তো বেহারী—সেই বাড়ীতে।"

"বাবা!"

"কি মীনু! লক্ষ্মীটী মা-আমার!"

"উঃ! বড় কষ্ট বাবা!"

*　　*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার সময় জ্বরটা একটু কম ছিল, মাথাটার দপ্‌দপানি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে! ভাবিলাম, কৈ বিদায় লইয়াও ত লওয়া হইল না, এত সব শান্ত স্থির হইয়া আসিল! হঠাৎ দ্বার হইতে কে ডাকিল, "মিনী, ভাই!"

"কে, কুন্তী আসিয়াছিস্? আয় ভাই, বোস্!"

আমার কপালটার উপর হাতখানি রাখিয়া কুন্তলা বলিল, "গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে! খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? ইস্, যা করে চিঠি লিখেছিস্? আমি ত ভয়েই মরে যাই!—নে ভাই, একটা বিছানা আমার এই ধারটা পাতিয়ে দে! আজকে থেকেই যাব!"

"সত্যি! রণেনবাবু?"

"কি মীনু! কি বল্‌ছো? বিছানা? আচ্ছা, আমি পাতিয়ে দিচ্ছি।"

আট

—নিভেছে মোর হাতের বাতি
জানিনে পথ—কোথায় সাথী
কারার কোণে কাট্‌ছে রাতি—
চরণ বাঁধা রে !

অন্ধকারময় উদ্দেশ্যবিহীন ব্যর্থ জীবনভার লইয়া আবার বাঁচিয়া উঠিলাম। পোড়া দেহশ্রী যেন দিন দিনই আবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কোথায়, কাহার জন্য ? নিঃসঙ্গ জীবনের আঁধার-ভরা দিনগুলি যে একাকী-ই কাটাইতে হইবে ! বাবা সেদিন বলিয়াছিলেন, রণেন বাবুকেই বিবাহ করিতে হইবে ! কিন্তু তা কি সম্ভব ? শক্তি, শক্তি দাও ভগবান ! এ আদেশ পালন করিবার শক্তি যে আমার আদৌ নাই ! তার চেয়ে বরং আবার বোর্ডিংএ গিয়া বাকী দিনগুলা কাটাইয়া দি-ই ! কিন্তু বাবা কি তাহাতে মত দিবেন ? আর রণেনবাবু ? তিনিই বা কি ভাবিবেন ?

"মীনু ?"

শেলাই হইতে মুখ উঠাইয়া বলিলাম—"কি বাবা ?"

"চল্ মা, কোথাও একটু ঘুরে আসি ! তোর শরীরের অবস্থা যা হয়েছে !"

"কোথায় যাবে বাবা ?"

"পুরীতে যাবি ? মাসখানেকের জন্যে ?"

বাবার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলাম—"যা ভাল বোঝ কর বাবা !

"তা-ই চল্ মা ! আর ভাল লাগে না এখানে !"

"তার পর ?"

"তারপর কি মা ? 'রণেনের কথা বলছিস্ ? সেও যাবে আমাদের সঙ্গে !"

"জানি না আবার কোথায় কি উদ্দেশ্যে ব্যর্থ জীবনভারখানি টানিয়া লইয়া চলিলাম.।"

* * *

এ যে চারিদিকেই কান্না ! কেবলই শত বেদনাভার বুকে লইয়া তরঙ্গসমূহের ফুলিয়া ফুলিয়া উঠা ! শত বিচ্ছেদভরা, অশ্রুসিক্ত মৌন চঞ্চল বক্ষখানি লইয়া যাহার প্রত্যাশায় পাগলের মত তীরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—সে চলা কি ব্যর্থ নহে ? বুক ফাটাইয়া আছড়িয়া পড়াই তাহার সার !

স্বর্গদ্বারের পার্শ্বেই যেস্থানে বাটীটা আমরা পাইয়াছিলাম, চারিদিক তাহার খোলা ! সমুদ্রের প্রচণ্ড হুঙ্কার একটা করুণ আর্ত্তনাদের মতই কানে আসিয়া বুকে গিয়া ঘা দিত ! কিন্তু মাঝে মাঝে এ সমস্ত আর্ত্তনাদ, বিদ্রোহী কোলাহল ছাড়িয়া ছোট্ট মনখানিকে যে সুদূর বাংলার একটী ঘরের উদ্দেশে আবার ছুটিয়া যাইত, তাহাকে বশে আনার সাধ্য তো আমার ছিল না !

বোর্ডিং ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি, প্রত্যেক দ্রব্যটীর মায়া নাগপাশের ন্যায় আমাকে যে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহার হাত হইতে কি মুক্তি নাই? কুন্তীর বিবাহ! নূতন জীবনের প্রথম সোপান! ভাবিতেও আনন্দে সমস্ত বুকখানি ভরিয়া উঠে! কুন্তলা, কুন্তলা! আমার কুন্তলা! তাহারই বিবাহ! আচ্ছা, এ বিবাহে তাহার কি সম্মতি নাই?—প্রাণে সে উন্মাদনা নাই?—চক্ষে সে দীপ্তি নাই? তবে—তবে এ তাহার বিবাহ, না—আত্ম-বলিদান?

কুন্তলার বৌদিদি বলিয়াছিলেন, ছেলেটী নেহাৎ মন্দ নয় এম-এ পাশ করেছে, স্বভাব-চরিত্তির ভাল, দেখ্‌তেও মন্দ নয়!

তবে!—এ বিবাহে কুন্তলার মত নাই কেন? এ আনন্দের তরঙ্গ ত সকলের প্রাণে গিয়াই ঘা দিয়াছে—তবে কুন্তী তাহাতে এত বিমর্ষ কেন?

তৃতীয় দিনে একখানি চিঠি আসিয়া হাজির! কুন্তী পত্রে লিখিয়াছে—

„ভাই মীনু!

“কত কষ্টে, কত চেষ্টায় আজ যে তোকে এই চিঠি লিখ্‌ছি, তা ভগবানই জানেন! হাত আমার অবশ হ’য়ে আসছে—চক্ষের আলো নিভে আস্‌তে চাইছে, তবু—তবু জোর ক’রে তাদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছি! শুনেছিস বোধ হয়, দুদিন পরেই আমার বিয়ে! কিন্তু এ কি আমার বিয়ে? নিরীহ মৌন ছাগল যেমন ব্যাধ্য হয়ে হাড়ী-

কাঠে গিয়ে মাথা ঢোকায়, আমারও যে এ তাই ভাই! সে মরণের পথে চলা-ছাগলের বুকে তখন যে কি কষ্ট, নির্ব্বোধ কশাই কি তা বুঝ্‌তে পারে?

"যাঁর সঙ্গে আজ আমার এ মহা বলিদানের অভিনয় আরম্ভ, শুনেছি, তিনি না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরপুত্র, তিনটে বিষয়ে এম-এ দিয়েছেন! কিন্তু ভাই মীনু, জীবনে কাউকে যদি আমি বন্ধু বলে, দিদি ব'লে উপদেষ্টা ব'লে ভালবাসি, ভক্তি করি, তবে সে একমাত্র তুই! তাই আজ তোকে সব কথা বল্‌ছি! তুই এসে হয়ত দেখ্‌বি, তোর কুন্তীকে আর একজন নিয়ে গেছে। তার স্বাধীনতা, তার হাসি, তার কান্না সমস্তই আর একজন তার হাতে তুলে নিয়েছে! কিন্তু ভাই এ বিয়ের চাইতে যদি আমার মৃত্যুর পরওনা এসে হাজির হতো, তাহলে হয় ত আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যেতুম!

"যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে, তার চেয়েও আর একজনকে যে আমি কত ভালবাসি,—আমার নিভৃত অন্তরের সুখ-দুঃখ সমস্ত যে তার পায়ে রেখেছি ভাই! আজ যদি তাকে ছেড়ে যাই, তাহলে শুধু আজ নয়, কাল নয়, চিরদিনের জন্যে যে পাপের ভাগিনী হয়ে—অকৃতজ্ঞতার বোঝা নিয়ে আমার জ্বলে মর্‌তে হবে! নারীত্বের সুখ—আত্ম-বিসর্জ্জনের মধ্যে,—নারীত্বের গর্ব্ব—আত্মত্যাগের মধ্যে! আজ যদি সেই ত্যাগ—সেই সুখ আমার দরিদ্র শ্রীহীন কুটীরবাসী প্রিয়তমের জন্যে ত্যাগ না করতে পারি, তবে কোথায় আমার এ নারীত্বের সুখ, গর্ব্ব?

"ভাই মীনু! জীবনের মহা সমস্যায় আজ আমি পড়েছি! এ সমস্যার সমাধান বোধ হয় আমি নিজেই করবো, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুই সুখে থাক্! বিদায়, বিদায় ভাই! যদি কখনও কোন অপরাধ তোর কাছে করে থাকি ত আজ ছোট বোন মনে করে সব ভুলে যাস্ ভাই, লক্ষ্মীটী দিদি আমার! বিদায়, বিদায় বন্ধু!

ইতি তোরই বুকের স্নেহে—গর্ব্বিত

কুন্তলা!

কুন্তী, কুন্তী, দিদিটী আমার! কেন ভাই আজ মৃত্যুর—(হাঁ মৃত্যু বই কি) বোঝাকে ঘাড়ে তুলে নিলি? ভালবাসিস্ লিখেছিলি! বড় ভুল করেছিস দিদি! ভালবাসা যে এ নয়—এ যে অভিশাপ!—জীবন-ভরা ব্যাকুলতার মধ্যে মর্ম্মান্তিক অভিশাপ।

পত্রটী পড়িয়া অবধি অন্তরের আত্মাটুকু আমার ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হে ভগবান, ওগো বিরাট জগতের একমাত্র অধীশ্বর যদি নারীকে সৃষ্টি করিয়াছিলে, তবে তাহাকে জগতের প্রচণ্ড ঘা সহিবার শক্তিগুলি দাও নাই কেন? নারী কি শুধু চোখের জল ফেলিবার জন্যই আসিয়াছে? জগতের সুখ, জগতের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিবার অধিকার তাহার কি বিন্দুমাত্র নাই?

"মীনু?—মিনতি!"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, রণেন বাবু।

"কাঁদছিলে কেন মিনতি? ও চিঠি কার?"

ছিঃ! এ কি দুর্ব্বলতা, এ কি লজ্জা আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল।

"চল, একটু বেড়িয়ে আসি, বুঝ্‌লে ?"

"আজকে নয়—শরীরটে বড় খারাপ হয়ে রয়েছে !"

প্রতারণা, প্রতারণা! এ কি হীনপ্রবৃত্তি। মুহূর্ত্তের জন্য একটী জীবন-ভরা অভিশাপের বোঝা স্বেচ্ছায় তুলিয়া লওয়া!

নয়

দশটা দিন আরও কাটিয়া গিয়াছে। সকাল বেলাটা সমুদ্রের তীরে লবণসিক্ত বালুরাশির উপর বসিয়া বসিয়াই কাটিয়া যায়! অস্তগামী সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় যখন সমস্ত বেলাভূমি আলোকিত হইয়া উঠে, ছোট্ট ইজি-চেয়ারখানি লইয়া বারান্দায় বসিয়া সমুদ্রের চঞ্চল লীলা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাটাও কাটাইয়া দিই! এ বৈচিত্রবিহীন কর্ম্মহীন অলস দিনগুলির মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এত শক্তিহারা করিয়া ফেলিয়াছি যে, অসম্বদ্ধ দিনগুলির বিদায়-মিলনের সহিত নিজের সম্বন্ধকে কখনও সুদৃঢ় করিয়া রাখিতে পারি নাই।

কুন্তলার আর কোন সংবাদ পাই নাই! কে জানে, এখন হয় ত অভাগিনী আর সংসার-পথ দিয়া স্বেচ্ছায় চলা-ফেরা করিতে পারিতেছে না। হিন্দুর গৃহে জন্ম তাহার,—ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকে হইয়া চলার উপায়

বা শক্তি তাহার নাই! প্রতি পদক্ষেপে এখন তাহার অধীনতার শৃঙ্খল! কুন্তী, দিদি আমার! পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের বোঝা ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছিলি,—এ বুঝি তাহারই শাস্তি! সত্যই তো! দুইটা প্রাণের মিলন যেখানে হইল না, কেবল মাত্র বাধ্য-বাধকতার ভিতর দিয়া সংযুক্ত করা হইল! সে কি বিবাহ? অরুণ বাবুর কি এমন শক্তি ছিল না, এ মহা বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন?

যাক্, পুরীতে আসিয়া অবধি এত অশান্তির কোলাহল মনের মধ্যে উঠিতেছে তাহার নিবৃত্তির উপায় ত কৈ খুঁজিয়া পাইতেছি না!

আহার শেষ করিয়া ইজি-চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া সেদিন-কার ডেলি নিউজখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, হঠাৎ রণেনবাবু আসিয়া বলিলেন, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ব'লে তুমি কাউকে চেন মিনু?'

বুকের মধ্যে কে যেন একটা নাড়া দিয়া উঠিল।

"হাঁ হাঁ, কি হয়েছে তাঁর রণেনবাবু?"

"নীচে ড্রয়িংরুমে তিনি বসে আছেন, তোমার সঙ্গে—"

দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম, রুক্ষ কেশ, মলিন বসন, বদন-মণ্ডল বিবর্ণ।

এ কি! এ চেহারা কেন আজ তাঁর?

আমাকে দেখিয়া একটু মলিন-হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"বসুন! আজ একটা ভয়ানক সংবাদ নিয়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি! কুন্তী এখানে আসে নি ত?"

"কুন্তী। কুন্তলা! না না, কি হয়েছে তার?"

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া একটা বজ্র পড়িলেও আমি বোধ হয় এতটা চঞ্চল হ'তাম না!

অরুণবাবু বলিতেছিলেন—"আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন, তার বিয়ের সমস্তই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল, এমন কি, আশীর্ব্বাদও তারা করে গিয়েছিল। তারপর বিয়ের দিন থেকেই তাকে পাওয়া যাচ্চে না, মিস্ রায়।"

স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম—"তার পর?"

"তারপর আর কি বলুন? যত পরিচিত জায়গা ছিল, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছি, মা-পাগলের মতন।"

"আর কোন খোঁজ নিয়েছেন তাঁ'র?"

ম্লান-বিষাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া অরুণবাবু বলিলেন—"খোঁজ আর কোথায় নেবো বলুন? জায়গা ত আর খুঁজে পাই না। তবে আমার বিশ্বাস, সুধীরের সঙ্গেই সে কোথাও চলে গিয়েছে, মিস্ রায়!"

"সুধীর, সুধীর কে, মিঃ চাটার্জ্জি?"

অরুণবাবু বলিতে লাগিলেন,—"সুধীর সে আমার বাবার এক বন্ধুর ছেলে! বি-এ পাস দিয়ে এম-এ, পড়ছিল, বড় গরীব তারা, কিন্তু হাঁ, স্বভাব তার ছিল ভারী মিষ্টি। সুধীরও কুন্তীকে খুব ভালবাস্‌তো।"

নিমেষের মধ্যে অরুণবাবুর সমস্ত মুখখানি গোধুলির মত লাল হইয়া উঠিল।

"উপায়?"

"উপায়? উপায় আর কি মিস্ রায়? যাক, তারা যদি সমাজের রক্তচক্ষু থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আপনাদের জীবনের প্রকৃত সুখ শান্তিকে ডেকে আনতে পারে, তাহ'লে সেও কি একটা সুখ নয় মিস্ রায়?"

ছিঃ! এ কি প্রশ্ন করিলাম, এ প্রশ্নের উত্তরে অন্তরের সমস্ত ধমনী গুলা যে আপনা হইতেই কাঁপিয়া উঠিবে, তাহা কে জানিত। মনুষ্যের বিবেক, জ্ঞান, আত্মমর্য্যদা—

মিস্ রায়

সেই স্বর, সেই ভঙ্গী, সমস্ত দেহটা আমার শিহরিয়া উঠিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিলাম—"কিছু বল্‌ছেন?"

"মাতৃহীন হ'লে মানুষের মন এত চঞ্চল হয় কেন বল্‌তে পারেন?

"এ কি প্রশ্ন? সামঞ্জস্য বিহীন, এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর নারী আমি, কি দিব?"

"বলুন মিস্ রায়! আর সেই জন্যেই বোধ করি, মনটা আমার এত চঞ্চল, এত উদ্বেগপূর্ণ হয়েছে।"

বাধা দিয়া বলিলাম,—"কেন, আপনার মা—"

"না মিনতি! আমার মা নেই।"

চমকিয়া উঠিলাম। "মিনতি! মিনতি!—কই এতদিন ত এ নাম লোকের মুখে মুখে শুনিতেছি, এমন সরল, এমন মিষ্ট হইয়া কোন দিন ত আমার কানে বাজে নাই?"

অরুণবাবু বলিতেছিলেন,—শুনেছি মিনতি, তোমারও মা নেই।

তোমার মতন জ্ঞান হবার আগে আমিও মাকে হারিয়েছিলুম! কিন্তু আবার মা পেয়েছি! শুধু সে কুন্তলার মা নয় মিনতি, সে আমারও মা!

শুভ্র সুন্দর কপোলখানি বহিয়া তাঁহার অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। বলিলাম,—"আপনার স্নান—"

"হাঁ মিনতি, এইখানেই করে নেব। খেয়ে দেয়ে দুটী এইখানেই শুয়ে পড়্‌বো, শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়েছে!"

দশ

—জীবনে যত পূজা হলো না
সারা,
জানি হে জানি আজও হয়নি
সারা।

কুন্তী, কুন্তলা আমার না জানি এখন কোন দূর ব্যবধানের অন্তরালে—চক্ষের দৃষ্টির বাহিরে—হাঁ, তবুও সে সুখী, তবুও সে পরিতৃপ্ত! চিঠিতে সে লিখিয়াছিল,—"নারীত্বের সুখ আত্মত্যাগের ভিতর, স্বার্থত্যাগের ভিতর!—মাতার স্নেহের দাবী ছাড়িয়া—সংসারের মমতার মায়া ছাড়িয়া, অর্থসুখ ত্যাগ করিয়া আজ সে যেখানে

গিয়াছে তাহার প্রিয়তমের সহিত ; না জানি, নারীত্বের গৌরব-শ্রী আজ তাহার মুখে কি সুন্দর আলোকের সৃষ্টিই না করিয়াছে !

বাবা কালও বলিতেছিলেন—'হাঁ মা, অরুণের সঙ্গে যতটুকু মিশলুম, দেখলুম, মনটী তার খাঁটী দুধের মতন ! জল তাতে নেই বল্লেই হয়। দেখিস্ মা, দুদিনের অতিথি ও, কষ্ট যেন কিছু না হয়।' তবে ? এই শুভ্র নির্ম্মল-দেবতার পায়ে, সকলের এমন কি নিজেও অজ্ঞাতসারে সমস্ত প্রাণটুকু ঢালিয়া দিয়াছি, তাহাতে কি পাপ আছে

ইস্, ঘুম যেন আর পোড়া চক্ষে আসিতে চাহে না। কেবলি চিন্তা—চিন্তা ! চিন্তায় একটী জাল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে আর একটী জালে আসিয়া কখন কেমন করিয়া ধরা দিতেছি, নিজে বুঝিতে পারিতেছি না ! ইজি-চেয়ার খানি বারান্দায় আনিয়া তাহাতেই গা ঢালিয়া দিলাম।

সম্মুখে অনন্ত উর্ম্মিমালা বুকে ধরিয়া অসীম সমুদ্র ছুটিয়া চলিয়াছে। উত্তাল তরঙ্গমালা কি এক দুঃসহ-ব্যথা পাইয়াই, বোধ করি, বেলা-ভূমিতে ছুটিয়া আসিয়া বুক ফাটাইয়া মরিতেছিল। উপরে কাল-আকাশের গায়ে জীবন্ত শিশুর মত উজ্জল তারা—নীচে ক্ষুব্ধ অসীম সাগর-গর্জ্জন, আর তাহাদের দ্রষ্টা হইয়া নিশুতি স্তব্দ রাতে আমি একা বিনিদ্র-নয়নে বসিয়া !

এই যে সমস্ত ছাড়িয়া, কুন্তলা সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী কে ? কুন্তলা?—না সমাজ নিজে ? এই যে দুটী তরুণ অন্তর নিভৃতে সকলের অজ্ঞাতসারে নীরবে আপনাদের প্রাণ বিনিময়

করিয়া লইল, তাহাদের সে মিলনের অন্তরায় হইয়াছিল কে ?—এই যে জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা—প্রীতি স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া অভাগিনী নারী—

"মিনতি !"

"কে রণেনবাবু ?—ওঃ অরুণবাবু , আসুন !"

"না না, তুমি বোসো,' আমি আর একখানা চেয়ার আন্‌ছি !"

ঘরখানি হইতে তিনি নিজে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, আর আমি স্থির হইয়া বসিয়া তাহা দেখিলাম। ছিঃ! কি মনে করিলেন তিনি ?

"তুমি ঘুমোলে না যে মিনতি ? এখানে কি রোজ এই সময়ে এসে বসো ?

ধীরকণ্ঠে বলিলাম—প্রায়ই !"

"আমার মতে, তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল মিনতি !"

আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া বলিলাম—কেন, বলুন তো ?"

"প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে প্রাণ যে কাব্যময় হয়ে পড়ে মিনতি ! কবি সৌন্দর্য্য দেখেই তো প্রেমের সৃষ্টি করে—প্রেম থেকে—"

"মিনতি, ঘুমুচ্ছ ?"

"কৈ, না !"

"অসুখ করেনি ত ? কৈ, দেখি হাতখানা ?"

কোলের উপর হইতে হাতখানি তিনি টানিয়া লইলেন। সে

স্পর্শে সমস্ত দেহটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। এ কি সুখের উন্মাদনা প্রতি ধমনীতে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া গেল?

ধর-ধরা গলায় আবার তিনি ডাকিলেন—"মিনতি?"

এ কি হইল আমার! যত চেষ্টা করিয়া উত্তর দিতে যাই, সে স্বর যেন গলার কাছে আসিয়াই থামিয়া যায়! এ কিসের শক্তি আজ আমায় মৌন মূক করিয়া দিল গো?

"মীনু!"

আবার সেই কণ্ঠ! ধীরে ধীরে আমার হাতখানি লইয়া তিনি দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। কি উন্মাদনা ছিল তাহাতে—কে জানে? বিদ্রোহী শিহরণের তাড়নায় মস্তকটা আমার, তাঁহার কাঁধের উপর ঢলিয়া পরিল।

এই তো পাইয়াছি! পলে পলে প্রতি দিন রজনী যাহার চিন্তায় বিনিদ্রভাবে কাটাইয়াছি, ওগো, এই ত আমার সেই দেবতা! আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের উজ্জল-দেবতা! মরণের পথে এখনই এই মূহূর্ত্তেই যদি ছুটিয়া যাইতে হয়, তাহাতেও বোধ করি সুখ আছে "চল মীনু, শুতে যাই! রাত হয়ে গেছে।"

অরুণ বাবু নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে আমারও ভাল লাগিল না।

এগার

বাবা বলিতেছিলেন—"না মিনু, রণেনকেই তোমার বিয়ে করতে হবে ? অনেক ভেবে দেখেছি আমি,—তা ছাড়া আর উপায় নেই !"

তা ছাড়া আর উপায় নেই ! কৈ, এ কথা ত বাবার মুখে কোন দিন শুনি নাই ? সেদিনও ত তিনি বলিয়াছিলেন—ভেবে দেখ মা. শেষে যেন আজিবন অনুতাপ করিস না !

"মীনু, তাহলে মত দি' রন্তুকে ! ও কি ! কাঁদছিস্ ?"

ছিঃ ! এ কি দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িল। অনেক কষ্টে বলিলাম—কিন্তু তাঁকে যে আমি অন্যভাবে দেখে আস্‌ছি, বাবা !"

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বাবা বলিতেছিলেন—"শোন মা, রন্তুকে,—না হয় অরুণের মতও আমি করাতে পারতুম—, কিন্তু অরুণ !—সে যে হিন্দু মা ?"

"হিন্দু ! হিন্দুর কি প্রাণ নাই, হিন্দুর প্রাণে কি প্রেম নাই ; ভালবাসা নাই ? তবে ?"

এ কি মহা সমস্যা আজ আলো ঢাকিয়া দাঁড়াইল ! বাবা বলিতেছিলেন—তা বলে হিন্দুর হাতে তোকে ত আমি ফেলে দিতে পারি না, মা ! কুসংস্কার নিয়েই যে জীবন কাটিয়ে এসেছে, আমাদের সমাজে তার স্থান নেই ত মা ! হাঁ, তবে অরুণ যদি আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে সন্তুষ্টচিত্তে দীক্ষিত হতে পারে, তবে মিনু, অরুণের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। কিন্তু সে কি রাজী হবে মা ?

"ছিঃ ছিঃ, শুধু আমার জন্য তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে? কৈ, এ পর্য্যন্ত কোন যুবকই ত তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই? হাঁ, এক-সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের তূর্য্য নিনাদ দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র যুবককে আহ্বান করিয়াছিল। তাহারাও আত্মপর ভুলিয়া—"

"কি বলিস মিনু! বল্ মা এখনি বেরুতে হবে।"

প্রাণ ভরিয়া যাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে সে ভালবাসা—সে প্রেম ফিরাইয়া লইব, কি করিয়া? ওগো অদৃশ্য বিরাট দেবতা! একি মহা সমস্যায় আজ আমাকে ফেলিয়া দিলে? ভালবাসা, লোকে বলে, পবিত্র, স্বর্গীয়—অতুলনীয়! একবার যাঁহাকে স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিয়াছি, কি বলিয়া আবার তাহা চাহিয়া লইব?

"বাবা!"

'কাঁদিস নি মা! ভেবে দেখ, এ বিয়েতে তোর মা আজ যেখানেই থাকুন, সুখী হবেন, অমত করিস না মিনু, ভাল করে সব বুঝে দেখ!"

শুষ্ক চক্ষু দুইটা আমার জলে ভরিয়া আসিল। বুঝিলাম না, এ কি শাস্তি আমায় লইতে হইতেছে! বাবা বলিলেন—"হাঁ, আর এক কথা মীনু! যদি বোর্ডিংএ গিয়ে তোর মন ভাল থাকে, তুই যা! তবে হাঁ, যাবার আগে একটা সান্ত্বনা তোর এ বুড়ো-ছেলের প্রাণে দিতে হবে যে, ফিরে এসে তুই এই রন্তুকেই বিয়ে কর্‌বি, বল্ মা, এতে তোর মত আছে কি না?"

"এই যে রন্তু যে ! এস বাবা !"

একখানি বই হাতে করিয়া রণেনবাবু ঘরে ঢুকিলেন, মুখখানি গম্ভীর—ঈষৎ মলিন !

"এই যে রন্তু, সেই কথাই বাবা, পাগ্‌লীটাকে বোঝাচ্ছিলুম্ ।"

রণেনবাবু সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না, কেবল মাত্র আমার স্বেদসিক্ত মুখের দিকে একবার তাকাইয়া লইলেন ।

"কি করবি মা, বোর্ডিংয়েই যাবি ত ?"

বলিলাম—"হাঁ বাবা, তা-ই যাব !"

"বেশ, বেশ ! এই তো আমার মেয়ের কথা ! আমি কি তোকে চিনি না মীনু ? তবে হাঁ শেষের কথাগুলিও মেনে চলিস্ । চল হে রন্তু, উঠ্‌বে না কি, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্ !"

বাবা চলিয়া গেলেন, বইখানি লইয়া রণেনবাবুও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

সত্যই-তো ! এ কি প্রতিজ্ঞা আজ পিতার সাক্ষাতে করিয়া বসিলাম ! রাখিতে পারিব কি ?

অন্তরের মধ্যে যে ছবিখানি বসিয়া গিয়াছে, তাহাকেই আবার জোর করিয়া উঠাইতে হইবে ! ওগো আমার গোপন-চিত্তের নিভৃত-দেবতা ! কেন তোমার ওই সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিলেন ?

রণেনবাবুকে বিবাহ করিতে হইবে । দোষ কি ? এই ত সে দিন মরণের গ্রাস হইতে আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তিনি আমায়

টানিয়া আনিলেন! তাহার কি একটা কৃতজ্ঞতা নাই? ছিঃ, না, না, বাবার কথাই মানিয়া চলিব। সত্যের পথে—পবিত্রতার পথে, কর্ত্তব্যের পথ হইতে যেন কোন দিন পথ-হারা না হই! হউক সে পথ পিচ্ছল, হউক তাহা দুর্গম,—সমস্ত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া সেই পথেই যাইতে হইবে!

কিন্তু পোড়া মন কেন শুনিতে চাহে না!—আত্ম সমর্পণ করিয়া আর কেন সে ফিরিতে চাহে না! চলিবে—যুগ যুগ ধরিয়া সে সেই পথেই চলিবে, যেখানে তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ এবং মুক্ত-চিত্তের সমস্ত প্রীতি ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছে! অনাবিল স্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় হউক, কিন্তু ওগো, যাহাকে একবার প্রাণ ভরিয়া ভাল-বাসিয়াছি, তাহাকে কি করিয়া বঞ্চিত করিব? এ প্রতারণা, এ হীনতা তাঁহার সহ্য হইবে কি?

কিছুই ভাল লাগিল না, এ চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম, পার্শ্বের গলিটা দিয়া একটা বখাটে ছোকরা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন?'—এ কি গান? না আমারই ব্যথিত অন্তরের প্রতিধ্বনি!

বার

উদ্দেশ্য-বিহীন ব্যর্থ জীবন-ভার লইয়া—সংসারের চঞ্চল বিশৃঙ্খলতার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলাম! বাপ্, কি অস্বস্তি! কি বেদনাভারকে বুকে চাপাইয়া দিনগুলি কাটাইতেছিলাম! আজ মনে হইল, সে সব ভার যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে তবুও, কি জানি, মাঝে মাঝে সমস্ত স্মৃতি আবার মনে পড়িয়া যাইত!

বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু কুন্তী কৈ?—অভাগিনী বোনটী যে আজ সমস্ত ছাড়িয়া বিদায় লইয়াছে। তাহার জন্য কেহ কি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিবে না? না না, এখানে সকলেই যে জানে, কুন্তলার বিবাহ হইয়াছে—স্বামীর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তবে?

লতিকা বলিল—"সত্যি ভাই মিনী, তুই যে আবার আস্‌বি, আমরা কেউ স্বপ্নেও তা ভাবিনি!"

মাধুরী বলিল—"আমি কিন্তু জান্‌তুম, ও আসবে! বাপ্, মোহিনী-মার্কা ঝোল কি ভুলা যায়? তা ছাড়া, Scientistরাও যে বলে গেছে —Earth is round.

ইহাতেও যেন শান্তি আছে! এই যে হাস্য-চপলা মেয়ে-গুলার সংসর্গ, ইহাতে মনটাকে তবু মুহূর্ত্তের জন্য ভুলাইয়া দেয়,—আর

হইবেই বা না কেন? সংসারের কুটীলতা সমস্যা এখনও তো উহাদের অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় নাই!

মণিকা-দিদি বলিলেন—"কুন্তলার কোন খবর জান মিনতি? বিয়ে থা কোথায় হ'ল?

বলিলাম—শুনি নি কিছু দিদি!"

কৈ, এ সময়ে মিথ্যা বলিতে কিছু আট্‌কাইল না ত! দিব্য অসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে বাহির হইয়া গেল!

স্নান করিবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। গামছা কাপড় কাঁধে তুলিয়া লতিকা আমার, 'সীটে' আসিয়া বসিল।

সত্যি ভাই মিনী, এ সব কি করেছিস, বল্ তো?"

"কেন রে?"

এই এত কাপড়, বাউস্,—যুগ কাটাবি না কি?"

দূর তা-ও কি কখন হয়?"

সহসা কে পেছন হইতে বলিয়া উঠিল—"হবে না কেন?—বিয়ে হলেই হয়!"

পেছন ফিরিয়া দেখি, রেণুকা!

রেণুকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, স্বামী বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখিতে গিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশানুসারে রেণুকা বোর্ডিংএ দিন কাটাইতেছে। লতিকা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—তুই এত পেয়েছিলি বুঝি?"

কেন পাব না? এর চেয়ে ঢের বেশী! এ তো—"

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে লতিকা বলিয়া উঠিল—"আরে যা যা, ভারী তো—"

"কি গো দুষ্টু মেয়েরা সব, ঘণ্টা পড়ে গেছে, শোন নি বুঝি?"

মণিকা-দিদি একটু গম্ভীরকণ্ঠেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আমার দিকে তাকাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"কিগো মিনতি রায়!" তুমি আবার New boarder হয়ে ঢুক্‌লে না কি? যাও, যাও, শীগগীর করে স্নান করে এস, আজ সব খেয়ে দেয়ে—Zoological gardenএ যাওয়া হবে। হাঁ, নীচেই যখন যাচ্ছ, দরোয়ানকে বলে দিও যে, বেলা দুটোর সময় চারখানা 'বাস', যেন ready রাখে; বুঝ্‌লে?"

সম্মতি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

বাথ রুমে ঢুকিয়া দেখিলাম, সেখানে আমার কথাই হইতেছে! শোভা বলিতেছিল—কুন্তী নেই বলেই বোধ হয় মনটা ওর এত ভারী-ভারী, দুটীতে ছিল ঠিক যেন—এই যে ভাই মিনতি, তোমার কথাই মণি বল্‌ছিল!

মণিমালা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"শুধু মণি বল্‌ছিল কেন, সকলেই ত বলছিলে বাপু!"

কুন্তলা! কুন্তী, আজ আমায় যে অন্ধকারে—ব্যর্থতার যে নিষ্পেষণে তুই ফেলিয়া গিয়াছিস, তাহা হইতে উঠিবার শক্তি যে আমার আর নাই ভাই! যেখানেই থাকিস ভাই, আজ এ

অভাগিনী দিদির সহানুভূতি তুলিয়া নে!—তোর ব্যথিত চিত্ত পরিতৃপ্তি লভুক!

তের

সকাল-বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি, প্রতিমা চেয়ারটার উপর পা ঝুলাইয়া দিয়া অনবরত বকিয়া যাইতেছে—Charity is the disposition of the heart which inclines men—চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলাম—সকাল-বেলাতেই charity, charity কচ্ছিস্ কেন রে প্রীতি? কবিতা পড়ছিস্ না কি!

আমার দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিমা বলিল,—'কবিতা পড়্তে যাব কোন দুঃখে! Charityর essay লিখ্তে দিয়েছেন মিস্ বোস্ মনে নেই?"

"হাঁ, তাই ত বটে! আজ যে শনিবার, সে খেয়ালটা আমার মোটেই ছিল না, স্কুল বন্ধ থাকিলেও বোর্ডিংএ প্রত্যেক শনিবার একটী করিয়া প্রবন্ধ ইংরাজিতে পড়া হইত! যাহারটা সুখ্যাতি লাভ করিত, সে দিনের জন্য গৌরব লাভ তাহারই হইত"

প্রতিমা বলিল—"তুমি Charity লিখ্বে না মীনু-দি?"

হাসিয়া বলিলাম—না ভাই, Charity ফ্যারিটীর দিকে আমার মন ঘেঁষে না অত!"

নমিতা ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা তৈয়ার করিতেছিল, বলিল—"হবে না কি এক কাপ, মিনুদি?"

রুদ্ধ আবেগ

"না ভাই, আজ আর নয়, শরীরটে বড় খারাপ।"

"কোন দিনই-বা তোমার শরীর ভাল থাকে বল? সোম মঙ্গল মাথা ধরা, বুধ গুরু জ্বর, শুক্র শনি পেটের ব্যাথা, রবিবারে বুক ধড়্ফড়,—কেমন, হয়েছে কি না, বলিয়া প্রতিমা সগর্ব্বের হাসি হাসিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল।

শোভা কবিতা লিখে বলিল—"হলো না'ত প্রীতি, শেষ লাইনটা মিল্‌লই না যে!"

"কথা কত বেশী হয়েছে দেখ্‌ছিস্‌ না?"

সকাল-বেলাটা কোনরূপে কাটাইয়া দিয়া মধ্যাহ্নটা শুইয়া কাটাইতেছিলাম, মাধুরী বলিল—"শুলে হবে না মীনু দি—অনেক দিন তোমার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়নি, নাও, ওঠ।"

"দোহাই ভাই, তোর পায়ে পড়ি, আজকে আর না।"

মাধুরী হাসিয়া বলিল—

"পা ধরে টানাটানি কর্‌লে কুন্তলা ছাড়তো মীনুদি! মাধুরী বোস ছাড়বে না!"

কুন্তলা! হাঁ, সত্যই তো! হতভাগিনী স্নেহ প্রীতি ও প্রগাঢ় ভালবাসা দিয়া আমায় এমন ডুবাইয়া রাখিয়াছিল যে, একটী দিনের তরেও তাহার কথার নড়্চড় হইতে পারি নাই। স্নেহসিক্ত মিনতির ভিতর তাহার যেন কেমন একটা আদেশ থাকিত, আর সে দাবী-দাওয়া বোধ করি আমি-ই তাহাকে স্বেচ্ছায় দিয়াছিলাম!

মাধুরীর বুকের উপর তাহার মাথা রাখিয়া অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"কি ভাবছো মীনুদি ওঠো, লক্ষ্মীটী !"

"না, ছাড়িবে না ! স্নেহের ভালবাসায় মুগ্ধ করিতে ইহারাও জানে। বাহির হইতেছি, তলব পড়িল মনিকা-দির ঘরে।

আমাকে দেখিয়া মনিকাদি বলিলেন—এই যে মিনতি যে ? কুন্তলারা তোমাদের কেউ হ'ন কি ? তার দাদা তোমার ভিজি-টর হয়ে এসেছেন ! যাও সাত নম্বর ঘরে. বুঝলে ?

কুন্তলার দাদা ! অরুণবাবু ? কোনরূপে টলিতে টলিতে বিছা-নায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি কেমন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব ? বাবার কাছে স্বেচ্ছায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজ নিমেষেই যে তাহা টুটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ওগো, কেন তুমি আসিলে ? এই ত বেশ হাসি-খেলার মধ্য দিয়া, উদ্বিগ্ন অস্থির চিত্তকে একরূপ বশ করিয়া আনিয়াছিলাম ; কেন তুমি আবার তোমার ঐ মূর্ত্তি লইয়া আমার সন্মুখে আসিলে ?

"দিদিমণি !"

"কে, দরোয়ান !„

"আপকো ভেট্‌কো বাস্তে আদমী বৈঠাল বা !"

"হাঁ, একটু বস্‌তে বলগে যাও, যাচ্ছি।"

দরোয়ান কিছু বুঝিল কি ? এ অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া আমার নিভৃত চিত্তের চঞ্চলতা ঐ অশিক্ষিত লোকটী কিছু জানিল কি ?

ছিঃ ! একি করিতেছি ? বাহিরে তিনি আমার অপেক্ষার—

সম্মুখে আয়নায় একবার মুখটা ভাল করিয়া দেখিয়া লই, কি জানি, যদি এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যের কোন ছাপ তাহাতে লুকাইয়া থাকে !

"এই যে, এসো, এত দেরী হলো যে মীনু ?"

এ বিলম্বের উত্তর কি দিব ? তাহা হইলে ত সেই ঘৃণ্য মিথ্যারই আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু তাহা ছাড়া আর উপায় কি ? অন্তরে যাহার হীনতার রাশীগুলি জমাট্ বাঁধিতেছে, বাহিরের সামান্য একটা মিথ্যাতে তাহার অধিক ক্ষতি কি হইতে পারে ?

বলিলাম—"ব্যাড মিণ্টন খেলা হচ্ছিল, খপর পাইনি !"

কৈ, গ্রাউণ্ডের কাছ দিয়ে এলুম, তোমায় ত দেখতে পেলুম না ?"

এবার কি বলিব ? মুখ দিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বাহির হইল—"বোধ হয়, দেখতে পান নি !"

চোখ দুইটী তাঁহার জ্বলিয়া উটিল, দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—কে,—আমি ? এ কথা বিস্বাস হয় তোমার মিনতি ? শুধু ঐ কজন কেন—অসংখ্য ভিড়ের মধ্যে থাকলেও দূর থেকে আমি আমার মিনুকে চিনে নিতে পারি !"

"আমার মিনু ? সমস্ত শরীরটা সহসা আমার কাঁপিয়া উঠিল, ছিঃ, বাহির হইতে কেহ শুনিয়া ফেলিল না'ত ?

কুন্তলার কিছু খবর পেলেন ?"

না মিনু, খবর কিছুই পাই-নি—আর না পেলেও বোধ করি কিছু ক্ষতি হবে না। মীনু ?"

আবার সেই স্বর—যাহার মৃদু ঝঙ্কারে একদিন সমস্ত হারাইয়াছি,

যাহার কোমলতার সুর অন্তরের প্রতি তন্ত্রীটীকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল।

"আর কতদিন এখানে থাক্‌তে হবে, লক্ষ্মীটা!"

ধীরে ধীরে বলিলাম—"তার ত এখনও কিছু ঠিক্ নেই অরুণ-বাবু! বোধ হয়, এ বছরটা থেকেও যেতে পারি।"

ইস, বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি মিনু, কিছু খেতে টেতে দেয় না এরা, নয়?"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম—"তা দেয়।"

আরও অনেক কথা হইল, শেষে তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আর কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমার থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না মীনু!

ছিঃ, ভিজিটিং রুমে বসিয়া এ সব কথা কহিতে লজ্জায় মাথাটা যেন আমার নীচু হইয়া আসিতেছিল, এই এতগুলি মেয়ে—যদি কাহারও কাণে যায়! ছিঃ, ভাবিতেও গা কেমন করে?

অরুণবাবু বলিতেছিলেন—"জানি না মীনু, কোন শুভ মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছিলুম। সেই দিন থেকে মনের সমস্ত অশান্তি গ্লানি আমার ধুয়ে মুছে গেছে! কেবল নির্জ্জন বেলাতটে একখণ্ড শুভ্র স্তরের মতই সেখানে পড়ে আছে তোমার স্মৃতি, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার হাসিমাখা মুখখানা—আর কিছু নয়।"

নীরবে আরও কয়েক মিনিট কাটিল, অরুণবাবু বলিলেন—"তবে আজ উঠি?"

'মীনু ওকি! কাঁদ্‌ছ? ছিঃ, আবার আসবো।"

ওগো হৃদয়ের দেবতা, এ ক্রন্দন ব্যথায় ঝরে নাই—দুঃখের পীড়নে আসে নাই, এ আসিয়াছে তোমারই ওই প্রশান্ত দেবমূর্ত্তিকে অভিনন্দন দিতে!"

যাইবার সময়ে আমার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন—"জেন মীনু, বিশ্বসংসার' ওল্‌ট-পালট হয়ে গেলেও তুমি আমার, আর আমি তোমার।"

অভাগিনী আমি—স্থিরদৃষ্টিতে কম্পিত পদে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিলাম, যখন চমক ভাঙ্গিল, অরুণবাবু নাই! লতিকা বলিতেছে, "এখনও দাঁড়িয়ে কেন মীনুদি, চল রুমে যাই।"

চৌদ্দ

তোমারি মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও গো মোরে—
এই জনমে ঘটালে মোর জনম জনমান্তর—
সুন্দর হে সুন্দর।

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি! বাবা বলিলেন—"চল মীনু, গরমটা বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসি—কি বলিস্?"

"কোথায় যাবে, বাবা?"

"তোর মামার বাড়ী যাবি?—হাজারিবাগে।"

মামার বাড়ী?—অভাগিনী মায়ের স্মৃতি-মন্দির—পবিত্র পুণ্য-তীর্থ! বলিলাম—তাই চল বাবা, সেই ভাল।"

বহুদিন—বহুদিন পরে আবার চলিয়াছি সেই স্থানে—যেখানে জন্মলাভ করিয়া, যে স্থানের জল বায়ু—আমার ক্ষুদ্র অসমর্থ দেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল।

রণেনবাবু আজ মাসখানেক হইল 'মাইনিং' পড়িবার জন্য ইথোরায় গিয়াছেন, যাইবার পর মাত্র একখানি পত্র তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহাও আমাকে নয়, বাবাকে লিখিয়াছেন। চিঠির একস্থানে লিখিয়াছেন—"মানুষের মন চায়—তৃপ্তি, মানুষের প্রাণ চায়—আকাঙ্ক্ষার পূরণ; অন্তরের অন্তরতম পুরুষটী চায়—ভালবাসা! কিন্তু কাকাবাবু আজ সে সমস্তই আমার কাছে আকাশ-কুসুমের মত হয়ে উঠেছে! তৃপ্তি, ভালবাসা, সুখ আমায় ইহজীবনে নাই! আর আমিও বোধ হয় এখন তা চাই না, আমার মন এখন চায়—কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়ে কোন রকমে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে! সে-ই এখন আমার সুখ, তৃপ্তি—পাওয়া না পাওয়া সব। এখানে এসে অবধি শরীরটে বড় ভেঙে পড়েছে—খাটুনী বড় বেশী। আপনি কেমন আছেন জানাবেন। 'মিনতি'র লেখাপড়া কেমন চল্‌ছে লিখ্‌বেন।"

ভগ্নহৃদয়ে—ব্যর্থতার বোঝাকে নিজের পিঠের ওপর চাপিয়ে নিয়ে যে চলিয়া গেছে, সত্যই তো তার জীবনে তৃপ্তি সুখ,—এই

সমস্ত ভূয়ো বাক্য—নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধকারাবৃত! কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? তিনি নিজেই নহেন কি?

মামার বাড়ী পৌঁছাইতেই একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বড়মামা বলিলেন—কিরে পাগলী, মনে পড়লো, এ বাড়ীর কথা? আমি বলি, বুঝি ভুলেই গিয়েছিস্!

মামি-মাদের আনন্দ আর ধরে না। ভাগ্নীটিকে লইয়া তাঁহারা কি করিবেন—কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন খুঁজিয়া পান না, ছোট মামি-মা আমাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া সুর করিয়া গান ধরিলেন—

এমন রূপের ডালি নিয়ে, লুকিয়েছিলি
কোন্ বনে—কোন্ বনে—

আহারে বসিলে দিদিমা বাবাকে বলিলেন—"তা মেয়ের বিয়ের কি বন্দোবস্ত কর্‌লে বাবা?"

"তেমন ছেলে আর পাচ্ছি কৈ, বলুন মা!—আর তা ছাড়া, পড়্‌চে যখন, পড়ুক্ না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে নয় তো যে, গৌরীদানের ফল নেবার জন্যে লাফালাফি কর্‌তে হবে!"

"কি পড়্‌চে এখনও?"

"এইবার তো ম্যাট্রিকুলেশন্ ক্লাসে উঠলো!—একটা বছর মাত্র আর বৈ ত নয়!"

দিদিমা বলিলেন,—'মিনীর-আমার মুখখানা হয়েছে ঠিক তার মায়ের মতন! আহা, মা-হারা দিদি আমার!'

"সেই যখন দু' বছর বয়স, তখন দেখেছিলুম, আর চোদ্দ বছর পরে আবার এই দেখলুম !"

বাবা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

কেন, আর দেখেন নি ?"

"দেখলুম আর কৈ বাবা ? সেবার ওর মা যখন এসেছিল, ও ত তখন তোমার কাছে—আগ্রায় ! তারপর সেবার উৎসবের সময় ? সে-ও তো তুমি ওকে নিয়ে গিরিডি না কোথা গিছিলে ! আর দেখ্‌লুম, কোথা বাবা ?"

সন্ধ্যার সময় মামীরা ধরিলেন—অর্গান বাজাইয়া একটা গান গাহিতেই হইবে ! এই যে এতদিন ধরিয়া বোর্ডিংে থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর কৃতীত্বের সহিত সঙ্গীত-শিক্ষায় প্রাইজ পাইয়া আসিতেছি, তাহার নমুনা এখানে দিতেই হইবে !

বলিলাম—"সব ভুলে গেছি মামী মা !"

"তা সেই ভুল-ই গাও দেখি ? ভুলই শুন্‌বো আমরা !"

কোন আপত্তি টিঁকিল না, একি মহা সমস্যায় পড়িলাম !

হাঁ, আর একদিন ঠিক এমনি পড়িয়াছিলাম্ কুন্তীদের বাড়ীতে ! কুন্তলার বৌদিদি-ও কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই, বিশেষতঃ অরুণবাবুর সুন্দর অনুরোধ !

"কৈ, গাও মীনু !"

বড়-মামীমার একমাত্র কন্যা সুরমা বলিল—"আমি অর্গান বাজাচ্ছি, তুমি গাও দিদি !"

সুরমা আমারই সমবয়স্ক—এই দিদি সম্বোধনটা তেমন মিষ্ট লাগিল না, বলিলাম—তুমি বাজাতে পার সুরমা ?”

“মোটেই না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি ! তুমি গাও তো !”

আপত্তি টিকিল না আদৌ। সুরমা বলিল—“একটা রবিবাবুর গান গাও মীনু দি—আমি বাজাই !”

শেষে বাধ্য হইয়াই গাহিতে হইল, সুরমা চাঁপাফুলের মত আঙ্গুলগুলিকে রীডের উপর নাচাইয়া নাচাইয়া বাজাইতে লাগিল—

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে,
ও তুই—বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না।
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

সম্মুখে শিথিল কালো আঁধারের বুক চিরিয়া সে সুর বাহিরে গিয়া মুক্ত বাতাসের বুকে লুটাইয়া পড়িতেছিল, তাহারই এক একটা ঝঙ্কার আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থতাকে যেন সুদৃঢ় করিয়া সহ্য-শক্তি দিতেছিল, অপলকনেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সুরমা বাজাইয়া চলিল—

বদ্ধ দুয়ার দেখ্‌লি ব'লে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে,
তোরে— বারে বারে ঠেল্‌তে হবে—

হয়ত দুয়ার খুল্‌বে না,

তা বলে, ভাব্‌না করা চলবে না!

জানি না, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এমনি কাতরভাবে প্রিয়তমের সুন্দর প্রীতি-মন্দিরের দুয়ার ঠেলিতে হইবে। কত পল দণ্ড—যুগে যুগে সে উত্তম লইয়া দ্বার উন্মোচনের জন্য সমস্ত চেষ্টাকে প্রয়োগ করিতে হইবে! পথের মাঝে অন্ধকার দেখিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, তাহার মধ্যেই যে সাফল্য।

"ও কি, কাঁদ্‌চো কেন মীনু?"

"সত্যই তো এ কি করিতেছি? পোড়া অশ্রু কি স্থান কাল মানে না—এত লোকের মাঝে। ছিঃ!"

সুরমা বলিল—"কি বল্‌চো কাকীমা, রবিবাবুর গান শুনে কাঁদেনি এমন লোকই নেই। যেমন গান—তেমনি সুর।"

"দিদি!"

"কে, সুধীর?—আয় না, ভিতরে আয়!"

"এ নাম পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছি না? বাহিরে আসিয়া মামীমাকে চুপি চুপি বলিলাম—"ইনি কে মামী-মা?"

"কার কথা বল্‌ছিস্, সুধীর?—ও, এই পাড়াতেই থাকে।"

"বেশ ছেলে। কি করেন বল তো?"

"কেন রে, সম্বন্ধ করবি না কি? তা, ওর আগেই হয়ে গিয়েছে লো!"

মুখ ঈষৎ বিকৃত করিয়া বলিলাম—"যাঃ, জিজ্ঞেস কর্‌লেই—"

মামী-মা বলিলেন, "না-রে পাগলি, ঠাট্টা নয়, এখানে মিত্তিরদের বাড়ী কাজ করে, তিরিশ টাকা করে পায়। সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই ওর।"

"বিয়ে হয়েছে কোথায়?"

বাধা দিয়ে মামী-মা বলিলেন—"সে কি আর ঠিক বিয়ে হয়েছে! রেজেষ্টারী হয় নি মোটেই।"

এ কি! এ যে সমস্তই মিলিয়া যাইতেছে। কুন্তী—কুন্তলা তবে কি ইহারই নিকট আছে?"

বলিলাম—"ওঁর স্ত্রীর নাম কি কুন্তলা, মামীমা?"

বিস্মিতনেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মামী-মা বলিলেন—"তুই কি করে জান্‌লি মীনু, এঁ্যা! ইস্, বড় অভাগিনী রে, বড় দুঃখিনী। হিন্দুর মেয়ে—কি আর কর্‌বে? তা, তুই তাকে জান্‌লি কি করে মিনু?"

"এই যে, বড় বৌদ্দি যে? ইনি?"

মামী-মা হাসিয়া বলিলেন—"বাঃ, বেশ লোক ত তুমি ঠাকুরপো, এ তোমার সমস্ত কথা বল্‌তে পার্‌লে, আর তুমি—ছিঃ ছিঃ ঠাকুরপো?"

তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতেই মামী-মা হাসিয়া বলিলেন—"তোমার কুন্তলাকে জিজ্ঞেস কর ঠাকুরপো, মিনতি রায়কে চেনে কি-না?"—কাণ দুইটা তখন আমার অসম্ভব রকম গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

পনের

কুন্তলা বলিতেছিল—স্বপ্নেও ভাবিনি মীনু, সুদূর বাংলার সীমানা ছেড়ে এসে, আবার হাজারীবাগে তোর দেখা পাব! কত দিন কত রাত্রি এই ছিন্ন মলিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোদের কথা ভেবেছি, বাড়ীর কথা ভেবেছি, বোর্ডিংএর কথা ভেবেছি,—চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে! বৌদিদিদের কথা ভেবেছি, দাদার কথা ভেবেছি—জানি না ভাই, তাঁদের কাছে যে অপরাধটা করেছি, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা? কিন্তু কি করবো—আমরণ যন্ত্রণা সহ্য করে আত্মঘাতী হওয়ার চেয়েও এই চির নির্ব্বাসনকে স্বেচ্ছায় তুলে নেওয়াই শ্রেয় মনে হলো, তাই বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই এঁর সঙ্গে চলে এলুম!

কুন্তলা নীরব হইল, গোধূলীর রঙীন আলোক তখন গাছের পাতায় পাতায় অপূর্ব্ব আলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল; মলয় বাতাস আসিয়া চারিপাশে আপনার সুবাস ছড়াইতেছিল। কুন্তলা আবার বলিল—এই যে দেখছিস্ চারিধারে দারিদ্র্যের ছাপ, অভাবের শত চিহ্ন, এর মাঝেও আমি সুখে আছি অনেকটা, যতটা বোধ হয় আমি সেই অতুল ধনবানের ঘরেও পেতুম্ না!—কেন, কে জানে! কাল রাত্রে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, পেট ভরে ভাল করে দুটী খেতেও পাই নি! কাঁদিস্ নি মিনী, এ-ও যে আমাদের সুখ ভাই!

"কুন্তী !"

"না মীনি, তুই এখনও জানিস্ না, এ ভালবাসা জিনিষটা কি ? আগুন দেখেছিস্ ? দেখ্তে বেশ সুন্দর-উজ্জ্বল, কিন্তু সে-ও আবার পুড়িয়ে মারে। মীনি ?"

তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম।

"কেন ভাই ?"

"এ পর্য্যন্ত কাউকে তোর পছন্দ হয়েছে ? ভালবেসেছিস্ ?"

এ কি প্রশ্ন ?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে আমার অবশ শিথিল শক্তির বাহিরে গো !

কে ভাই তিনি ! দাদা ?

"চম্‌কে উঠ্‌লি যে কুন্তী ! আজও জানিস্ না কুন্তী, তোর দাদা আমার অন্তরের কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে !"

সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ আলোক-রেখা পাইলে ভ্রান্ত পথিক যেমন লাফাইয়া উঠে, কুন্তলাও তেমনি শিহরিয়া উঠিল !

"হিন্দু হতে পার্‌বি, মীনি ? ভেবে দেখ দিদি খুব ভাল করে, শেষে সব যেন হারাস নি, পার্‌বি ?"

"তুই এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস্ কুন্তী ?"

"না না, ভুল হয়েছে দিদি, ক্ষমা কর্ !" দুই হাতে আবেগের সহিত কুন্তলা আমায় জড়াইয়া ধরিল, কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু বুঝি মিলন–অভিষেকের শান্তি-বারি আনিয়া দিল।

ওগো নৈশগগনের উজ্জ্বল দেবতা, দীপ্তচক্ষু মেলিয়া আজ চাহিয়া

দেখ, ইহার চেয়েও পবিত্র স্নেহ ভালবাসা ধরিত্রীর বুকে কখনও স্থান লভিয়াছে কিনা ?

সত্যই তো, এই যে আপনার মান, গর্ব্ব, আত্মীয়—সমস্ত ছাড়িয়া শুধু আপনার প্রিয়—সমগ্র জগতের চেয়েও প্রিয় বস্তুটী লইয়া ঘোর দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে, কৈ, তাহাতে ত নারী এতটুকু দুঃখিত হয় নাই, বরং স্বামীগর্ব্বে অন্তর তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কুন্তলা বলিল—"আচ্ছা মীনু, স্বামীর চেয়েও আর কাউকে বেশী ভালবাসা যায় না, নয় ?"

তাহার গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিলাম—"দূর পোড়ারমুখী, ও কথা মনে আনাও যে পাপ !"

"সত্যি মীনু, আমারও তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাবি, সমস্ত সংসার উলট্ পালট্ হয়ে গেলেও আমি যেন আমার স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরতে পারি ! এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, এই স্বামীর জন্যে মাকেও ছেড়েছি মীনু, কিন্তু তিনি কি আর আমাকে ক্ষমা করবেন ?" তা ছাড়া, উপায় আর ছিল না যে ভাই !"

কুন্তলা চুপ করিল, সন্ধ্যার বিষাদজড়িত ম্লান-আঁধারকে বরিয়া লইবার জন্য শঙ্খধ্বনিতে চারিদিকে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

"কুন্তী !"

আমার এ সহসা আহ্বানে কুন্তলা চমকিয়া উঠিল। বলিলাম—"লক্ষ্মী দিদিটী—যা দিচ্ছি, উপেক্ষা করিস নি, নে ভাই !"

কুন্তলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল—'সাহায্য' দিচ্ছ মীনু ! না

ভাই, মরে গেলেও আজ তা নিতে পারবো না, এ দারিদ্র্যকে যখন স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছি, তখন তার ফলভোগ করতে দে ভাই, তা-ও যে আমার কাছে মিষ্টি! রাগ করলি দিদি?"

জোর করিয়া বলিলাম—"এ দান নয় কুন্তী, মনে কর, তোদের বিয়ের—"

"হাঁ, তাহলে নিতে পারি মীনু-দিদি! কিন্তু এ দারিদ্র্য দেখে সাহায্য তোমায় করতে দেব না!"

"কুন্তী, কুন্তলা! জানি না ভাই, আজ যে শিক্ষা তোর দিদিকে দিলি, সে শিক্ষার মূল্য কত, গৌরব কত?"

কুন্তলা বলিল—"তোর মামার বাড়ী থেকে গাড়ী এসেছে ভাই! নে, এইটে শুধু মুখে দিয়ে যা! কিন্তু পেট ভরবে না মোটেই!"

"বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়োতে পেট কার-ই বা ভরে বল্? চিঠি লিখিস্ ভাই, বুঝলি?—হাঁ, বোর্ডিঙে!"

বাড়ী ফিরিতেই মামী-মা বলিলেন, "কি, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, মিনতি! খাওয়ালে কি?"

সুরমা কথা কাড়িয়া বলিল—"সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ।"

একটু গম্ভীর ভাবে বলিয়া ফেলিলাম—"না সুরমা, তার চেয়ে বড় জিনিষ, সন্দেশ রসগোল্লা তার কাছে ঢের তেঁতো।"

ষোল

আমায় যদি না-দেখা দাও
কর মোরে হেলা
কেমন করে কাট্‌বে আমার
এমন বাদল-বেলা ॥

ওগো আমার অন্তরাত্মার একমাত্র আরাধ্য-দেবতা! এই পরিত্যক্ত জীবনটাকে তোমার সুন্দর কোমল পায়ে আশ্রয় দিয়া এ নগণ্য অন্তরকে সফল করিয়া তোল—ধন্য কর! শত বিষাদ-জড়িত অন্ধকার ভরা পথের মাঝে সুখপূর্ণ আলোকজ্যোতিঃ ছড়াইয়া দাও। আঃ, ইহাতেও যেন শান্তি আছে।

এই ত দেখিতে দেখিতে পনেরটা দিন কাটিয়া গেল। হাজারি বাগ হইতে চলিয়া আসার পর কুন্তলার কাছ হইতে মাত্র একখানি পত্র পাইয়াছি। হতভাগিনী তাহার দেবতার জন্য যে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার সাফল্য কতদূর সুন্দরভাবে তাহাতে দেখা দিয়াছে তাহাই লিখিয়াছে—আরও লিখিয়াছে যে, আত্মবিসর্জ্জনের ভিতর উৎকণ্ঠা আছে, সন্দেহ ও ভীতির চিহ্ন আছে—তাহার আশা করা বৃথা!

ছোট পড়িবার ঘরটীতে বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম। কোন সুদূর কল্পনা হইতে ধীরে ধীরে একটী মহা অভিনয় সংঘটিত হয়—

রুদ্ধ আবেগ

অস্পষ্ট স্মৃতি পরিয়ে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া গোপনে একটী সুদৃঢ় আত্মীয়তা সৃষ্টি করে, তাহা প্রথমে কেহই জানে না! হায় রে অজ্ঞাত মূঢ় জীবন! মরীচিকা লক্ষ্য করিয়া তুমি ধাবমান হও—সত্য আলোকের সহিত তোমার পরিচয় কোথায়?

এই যে এক দুই করিয়া পনেরটী দিন কাটাইয়া দিলাম, এই যে ধীরে ধীরে পরিস্ফুটতা মলিন হইয়া দেখা দিল, কৈ, ইহার মধ্যে আপনার প্রাপ্য দুঃখপূর্ণ সমস্যা লইয়া ত বিচার করিলাম না!

কুন্তলা যে সেদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল যে, স্বামীর চেয়ে আর কাহাকেও ভালবাসা যায় কি-না?—এ কথার সত্য উত্তর কে দিবে? নির্ভীক সত্যকামী উন্নতহৃদয়? হাঁ, তাহা পারে বটে, কিন্তু যে স্থানে একটা বাধ্য-বাধকতার ভিতর দিয়া একজনকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া লইতে হয়, যেস্থানে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে সে বরণকে অগ্রাহ্য করে, সেস্থানে সে স্বামীত্বের মূল্য কি? ওগো, ভালবাসা তাহাকে দৃঢ়চিত্ত হইয়া অর্পণ করা যায় কি করিয়া?

নারী! সমস্ত জগতের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার সার হইতেই বুঝি এই নারীত্বের সৃষ্টি!

দূর ছাই, এ সব কি ভাবিতেছি? চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু কোথায় গিয়া এ চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইব? চারিদিকেই যে তাহার রক্তদৃষ্টি আমায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! কেমন করিয়া এ দীপ্ত উজ্জ্বল—

"মীনু!"

চমকিয়া উঠিলাম। পেছন ফিরিয়া দেখিলাম, রণেনবাবু দাঁড়াইয়া। চক্ষে সেই সরস দৃষ্টি, মুখে সেই কোমলতা—কয়েকটা মাসের মধ্যে তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্য যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"অসময়ে হঠাৎ দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, না মীনু? আমার আস্‌বার কিছুই ঠিক ছিল না, কলেজ বন্ধ হ'তে, কি মনে হলো জানি না, কালই বেরিয়ে পড়লুম, বাড়ীর সব ভাল ত?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া সজোরে আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিল! ওগো, তাহাকে দমন করিবার শক্তি আমার কই,—কোথায়—কে দিবে? আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম—"নীচে বাবা আছেন—"

"হাঁ মিনতি, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ওপরে এসেছি শুধু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে!"

বজ্রের মতন গম্ভীর হইয়াই তাঁহার স্বরটা আমার কাণে আসিয়া বাজিল। এ রুদ্র-বাণী, কৈ, কোনদিন ত তাঁহার মুখ হইতে শুনি নাই, এত কোমল, এত ধীর অথচ এত গম্ভীর!

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিতেছিলেন—"শুধু দেখা কর্‌তে আসি নি মীনু তোমার সঙ্গে! এসেছি—আমাদের জীবনের মাঝখানে যে মহা সমস্যা আজ সুদৃঢ় পাঁচিলের মত এসে দাঁড়িয়েছে, তারই বিচ্ছেদ কর্‌তে! সে বাধা একটা কালো-মেঘের মত ঘনীভূত

হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ আকাশকে কালো করে দিয়েছে, শান্তি ও ভালবাসা দিয়ে আবার সেই আকাশকে আমি রঙিয়ে দিতে চাই মীনু! তবে তা'র প্রধান উপায় তোমার হাতে মীনু!"

এ কি গুরু কম্পন, এ কি চাঞ্চল্য আমার মূঢ় দুর্ব্বল হৃদয়ে তুমি জাগাইয়া দিলে প্রভু? আমি যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না ইহার জন্য।

চুপ করে থেক না মিনতি, কারণ সময় আমার খুবই অল্প, আজই আমি গিরিডি চলে যাচ্ছি! আমি কেবল আজ জান্‌তে চাই, তুমি— আমি তোমার যোগ্য কিনা? বল মিনতি, আজ তোমার উত্তরের ওপর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ সব নির্ভর কর্‌ছে!"

'নারী আমি, বিধাতৃ অভিশপ্ত লাঞ্ছিত জীব! জগতের সমস্ত অধিকার-হারা কামনা-হারা নারী! তাহারই আজ একটী কথার উপর পূর্ণ অধিকারগত একটা পুরুষ-জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে! ওগো, কেমন করিয়া এ কথা আজ বিশ্বাস করিব? কিন্তু, কিন্তু স্বেচ্ছায় যাহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আপনার সমস্ত অধিকার— সমস্ত কামনা বিলাইয়া দিয়াছি, কেমন করিয়া ওগো,—না না, এ ক্ষীণ দুর্ব্বল জীবনে তাহা পারিব না! তাহা হইলে শুধু আজ নয়, কাল নয়,—আজীবন, আমরণ একটা বিশ্বাসঘাতকতার তীক্ষ্ণ কণ্টককে বুকে লইয়া বেড়াইতে হইবে!

"তাহলে আমাকে এমনই চলে যেতে হলো মিনতি! তবে জেনো, এ জিজ্ঞাসা, এ মহা সমস্যার সমাধান কর্‌তে আমি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে আসি-নি, তোমার বাবার আদেশেই—"

সহসা তিনি চুপ করিয়া গেলেন, এক একটী স্বর তাঁহার—আমার অন্তরে গিয়া যে বিদ্রোহের স্থচনা করিতেছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে বুকের এক একখানি পাঁজরা যেন তাহারই আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আবার তিনি গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন—

"আচ্ছা, আসি তা হলে মিনতি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও—' এর বাড়া বল্‌বার আমার আর কিছু নেই, আর বোধ করি, তার অধিকারও নেই। গিরিডি থেকে কবে কোথায় যাব তার ঠিক্ নেই, তবে এখানে আসা আমার বোধ হয় এই শেষ।"

ওগো অন্তরের মৌন-দেবতা, এ কি সুদৃঢ় সুকঠিন অস্ত্র দিয়া আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিলে? ফিরে এসো, ওগো ফিরে এসো!—আজ এ তীব্র অভিমান হইয়া পুরুষ তুমি কোথায় ছুটিয়া যাইবে? এসো—জোর করিয়া আজ এ নারীর অন্তর শত আঘাত-প্রতিঘাতে চূর করিয়া দাও! কিন্তু কোথায়, কেমন করিয়া—না, না—রণেনবাবু? এসো ভাই, আমার এ তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে আজ চূর্ণ করিয়া দাও! ইস্!

"মীনুদিদি!"

"কে, মনীষা, আয় ভাই।"

সতের

স্কুল খুলিতে আর মোটে দশটা দিন বাকী। সংসারের অশান্তি দুর্ব্বল অন্তরের কাছ হইতে এবার বোধ হয় মুক্তি পাইব, সরল পথ চিনিয়া যে অনন্তের পথের দিকে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, জীবনে তাহার ভয় কি?—সত্যই যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, ভাল হউক, মন্দ হউক তাহাকেই আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের 'আলোক-দণ্ড' বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে! তবে? কোথায় রহিল আমার স্বাধীনতা, আর কোথায় রহিল আমার ইচ্ছাশক্তি? ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ত সেই কর্ত্তব্য-পূর্ণ বাধ্য-বাধকতার ভিতর আসিয়া পড়িলাম!

কুন্তলা লিখিয়াছে, ছয়টী মাসের মধ্যেই তাহাদের সংসারে ভগবান-প্রেরিত একটী অতিথি আসিতেছে। সুখী হউক, চিরশান্তি আসিয়া তাহাদের সংসারের ভিত্তির সহিত মিশিয়া যাউক, ভগবানের নিকট আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, আন্তরিক ইচ্ছা।

কুন্তলার ছেলে হইবে, সংসারের সব চেয়ে বড় দায়ীত্ব এবার সে হাতে পাইল। নারীত্বের সাফল্য—নারীত্বের গৌরব এই স্থানে। মা হওয়ার চেয়ে নারীর আর কি সুখ থাকিতে পারে? মাতৃত্ব—স্বর্গীয় পবিত্র প্রাপ্তির পরিচয়!

সুধীরবাবুর সহিত ক্ষণিক পরিচয়ে যে সুখ পাইলাম—হাঁ, গর্ব্ব করিবাব বটে! অমন স্বামী পাওয়া গৌরবের বিষয়, অমন ভাই পাওয়া গৌরবের বিষয়—কি স্নিগ্ধ উদার ব্যবহার!

আজ কয়েক দিন ধরিয়া শরীরটা এত খারাপ ঠেকিতেছে! কে, মনীষা! আয়, ভেতরে আয়!

দারিদ্র্যের তীব্র অভিশাপকে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া সংসারে বিশৃঙ্খলতাকে যদি কেহ বরণ করিয়া থাকেন ত—এই মনীষার বাবা! ছিঃ, অসৎচরিত্রের আবর্ত্তনে আপনাকে ফেলিয়া যে দুঃখ কষ্ট তিনি সংসারে বসাইতেছেন, আহা, দেখিলেও কষ্ট হয়! মনীষা সেদিন বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার বিবাহের জন্য তাহার মা রোজই কাঁদেন, কত দেবদেবীর নিকট মাথা খুঁড়েন, কিন্তু হা রে! অদৃষ্টে যাহার দুঃখের—বিপদের বোঝা বহন আছে, মুক্ত থাকিবে তাহারা কি করিয়া?

"মনীষা!"

ডাক শুনিয়া মনীষা বোধ করি চমকিয়া উঠিয়াছিল, করুণ অথচ উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"তাঁদের ওখান থেকে আর কোন খবর এসেছে, শুনেছ?"

মনীষা চুপ করিয়া রহিল, সমস্ত মুখটা সহসা সিঁদূরের মত লাল হইয়া উঠিল।

"তা হলে হয়েছে মনীষা?"

মুখ নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে মনীষা উত্তর দিল—হয়েছে।"

"হয়েছে! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ বোন—এইখানেই যেন সুখী হতে পারিস? বল্ মণি, এ বিয়েতে তোর বাবার মত আছে ত?"

"কিন্তু আমরা যে বড় গরীব, মীনু-দিদি!—" মনীষার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

গরীব? হাঁ তাই ত! এক পয়সার সংস্থান আজ যাহার নাই, কেমন করিয়া সে এই মহা-দায়ীত্বের ভারকে কাঁধে তুলিতে সম্মত হয়? হা রে অভাগী, এ কি বিড়ম্বনা তোর?

"উপায়?"

মাথা নীচু করিয়াই সজল চোখে মনীষা বলিল—"উপায় ভগবান মীনুদিদি, এখানে না হলে—"

বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিলাম—"তোমার বাবা বাড়ী আছেন মনীষা? আচ্ছা, শীগ্গীর একবার তাঁকে আস্তে বল্ না ভাই, নীচেকার ঘরে। বুঝ্লে?"

আঃ! ইহাতেও যেন আরামের একটা ধারা আসিয়া সমস্ত অন্তরকে জুড়াইয়া দেয়, কিন্তু এ কি—একটা?—প্রতিদিন কত হতভাগ্য দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া মরণের কোলে মাথা পাতিয়া দিতেছে, তাহার যে সংখ্যা নাই! অভাবের পীড়নে, অন্নের অভাবে সংসারের মধ্যে প্রত্যহ কত নৃশংস হানকার্য্য অবাধে অম্লানভাবে চলিয়া যাইতেছে, তাহা যে গণনাতীত। কিন্তু হৃদয়ে যাহার এ বেদনার সুর গিয়া আঘাত দিতে পারে নাই, সে কি করিয়া বুঝিবে এ তীব্র দাহন?

ড্রয়িংরুমে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, হঠাৎ মনীষার বাবা ডাকিলেন—"মীনু, আমায় ডেকেচ মা?"

"হাঁ কাকাবাবু, বসুন।"

এবার কি প্রশ্ন করিব? এই ত একটা উত্তেজনার বশে ভদ্রলোককে ডাকাইয়া পাঠাইলাম।

"কোন কাজ আছে কি ছোট-মা, বল?"

"মনীষার বিয়ে কোথায় ঠিক্ করলেন, কাকাবাবু?"

কথা কয়েকটী বলিতে গিয়া হঠাৎ জিভ্ যেন আটকাইয়া আসিতেছিল।

বিষাদ-সিক্ত স্বরে তিনি বলিলেন—"বিয়ে ত ঠিক করেছি মা! কিন্তু—"

"কিন্তু কি, কাকাবাবু?"

"টাকার দরকার মা! গরীবের ঘরে আগুন লাগলেও গরীব বোধ হয় এতটা সর্ব্বস্বান্ত হয় না, যতটা হয় মেয়ের বিয়ে দিতে! সে সব তোমরা বুঝ্বে না মা, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তা-ও যেন বুঝ্তে না হয়!"

"কত টাকা হলে কাজ মিটে?"

"সে যে অনেক টাকা ছোট মা! তবে আর দুশো টাকা পেলেই, বোধ হয় আমি চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু তা-ও যে আর পাওয়া সম্ভব হয় না, মা!"

ভগবান, এক শাস্তি! এই শাস্তি এই দরিদ্র জাতিটার উপর তুমি

প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না? ওগো, সারা জীবনব্যাপী একি মর্ম্মন্তুদ করুণ দৃশ্য তুমি এ হতভাগ্যদের জীবনপটে ফুটাইয়া তুলিতেছ!

"কাল সকালে একবার দয়া ক'রে আস্‌বেন কাকাবাবু! আমার ইচ্ছে, এ বিবাহে—"

দৃপ্তচক্ষু তাঁহার জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন—দান দিবার কথা বল্‌ছো মা?

"না কাকাবাবু, সে স্পর্দ্ধা এখনো আমার হয়-নি, তবে মনীষাকে ছোট বোন ব'লেই দেখে এসেছি, দিদি হয়ে কিছু আমি ওকে দিতে চাই কাকাবাবু!"

"বেশ, তাই করো মা। হাঁ, আর এ বিয়েতে তুমি না যোগ দিলে বড়ই দুঃখিত হ'ব আমি। দিদি যদি না বোনের—"

"না কাকাবাবু—মনীর বিয়েতে আমি যাবই।"

"মনীষা, দিদিটী আমার! আশীর্ব্বাদ করি, তোর আরাধ্য দেবতার পায়ে আমরণ স্নেহ প্রীতিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িয়া থাক। এ তোর জন্ম-জন্মান্তরের আশা,—অন্ধকার-মাখা কালো জীবনের মধ্যে এ তোর উজ্জল-আলোকের সুস্পষ্ট রশ্মি!"

আঠার

আজ মনীষার বিবাহ।—শুধু বিবাহ নয়, আজীবন সুখ-দুঃখের ভাব লইয়া আজ যিনি তাহার সম্মুখে আসিয়াছেন, আমরণ তাঁহারই দাসী হইয়া থাকা! ইহাতেও না জানি কত সুখ, কত গর্ব্ব! স্বামী এই যে ছোট্ট দুটী অক্ষর, ইহার মধ্যে কত বড় দায়ীত্ব লুকান আছে, কত মিষ্টতা, কমনীয়তা লুকাইয়া আছে—ওগো, তাহা কে জানিবে? ক্লান্ত পথিক যেমন সঙ্গী-হারা অবস্থায় ক্লান্তি বিনোদনের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করে, ইহাও ঠিক তেমনি। মনীষাও আজ তাহার চলা শেষ করিয়াছে, এখন সে ক্লান্ত—আর তাহারই আশ্রয় হইয়া না জানি কোন্ দেবতা তাহার সম্মুখে আসিবেন!

বাবা ঘরে ঢুকিলেন, অন্যান্য দিনের চেয়েও স্বরটা আজ যেন তাঁহার কিঞ্চিৎ গম্ভীর। ডাকিলেন—মিনতি!"

"কেন বাবা?"

"মনীষাদের বাড়ী যাবে না? তার বাবা বল্‌তে এসেছিলেন।"

শরীরটা বড়ই খারাপ ঠেকিতেছিল, বলিলাম—"না বাবা, শরীরটা বড় খারাপ!"

"তবে কথা দিয়েছিলে কেন, মিনতি!"

কৈ, এ মূর্ত্তি ত বাবার কোন দিন দেখি নাই!—এত কঠোর, এত রুক্ষ, চোখ ফাটিয়া আমার, জল আসিবার উপক্রম হইল; এমন কি

দোষ আজ করিয়াছি, যাহার জন্য আজ আমার এই শাস্তি। ডাকিলাম—"বাবা!"

মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন—কিছু বল্‌তে চাও আমায়?"

কণ্ঠস্বরে তাঁহার সেই বিরক্তি! আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিতেছিলেন—ভেবেছিলুম মিনতি, আমার মেয়ে আমার মেয়ের মতনই থাক্‌বে, অবাধ্যতা তার কোনদিন—

"বাবা!"

"কেঁদ না, মিনতি! সব শুনেছি, সব জেনেছি আমি, রণেনও আমায় বলেছে যে; এ অপমানকে সে স্বেচ্ছায় তুলে নিতে আসে নি, দিয়েছে শুধু আমারই জন্যে! শেষ একটা ইচ্ছে তোর কাছে চেয়েছিনু মিনু, আর ভেবেছিলুম, সে ইচ্ছে পূরণ তুই করবি-ই। সেদিনের কথা মনে পড়ে?"

অন্তরটা আমার কেবলি মোচড় খাইয়া উঠিতেছিল, সত্যই তো যে প্রতিজ্ঞা তাঁহার সম্মুখে করিয়াছি, কৈ, তাহা রাখিতে পারিলাম না তো। শক্তি দাও ভগবান, এ কি শক্তিহারা আমায় তুমি করিয়া দিলে!

সুদূর অনন্ত যেস্থানে আপনার সীমা হারাইয়া মাটীর সহিত লজ্জায় সঙ্কোচে মিশিয়া গিয়াছে, মূঢ়ের মত সেইদিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। কোন্ তরুণ চিত্তের সুস্বর-লহরী তখন বাহিরে মুক্ত বাতাসের বুকে আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। আর সেই তরুণ

কণ্ঠের মৃদু ঝঙ্কার বাতাসের সহিত মিশিয়া কাণের ভিতর ধ্বনিয়া উঠিতেছিল—

জাগ্রত কর, উদ্যত কর—
নির্ভয় কর হে,—
মঙ্গল কর, নিরলস কর
নিঃসংশয় কর হে।

ওগো, একি মহা উদ্বোধন-বাণী আজ তুমি বাতাসের ভিতর দিয়া আমার কাণে শুনাইয়া গেলে! হে বিরাট দেবতা, দাও—এ সুপ্ত নির্জ্জীব জীবনকে তোমার সুধারস দিয়া জাগ্রত করিয়া দাও, অসংযত দুর্ব্বল চিত্তকে নিরলস করিয়া তাহাতে মঙ্গল-বারি সিক্ত করিয়া দাও।

একি গান? না আমাকেই সাহস প্রদান করিবার জন্য সুদূর হইতে আশ্বাসবাণী আসিতেছে। অন্তরের প্রতি মর্ম্মটী কাঁপাইয়া একি প্রার্থনা-বাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে—

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর হে সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ!

বাবা ডাকিলেন—"মিনতি, গীনু।"

"কেন বাবা?"

আবেগভরে আমার মাথাটীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন-

"রাগ করলি মা?—মনে কষ্ট হয়েছে মা, ছিঃ!"

এ কি। বাবারও দুই চোখ বহিয়া অবাধ্য অশ্রুবিন্দু ছুটিয়া আসিল—অশ্রু নয়—স্নেহের উৎস !

"তাঁকে ফিরিয়ে আন বাবা ? তোমার কথাই—"

"কিন্তু কোথায় সে গিয়েছে, বলে ত যায় নি মা ! বড় অভিমানী সে, মীনু ! যাবার সময় কোথায় গিয়েছে—"

"আমি জানি বাবা !"

দীপ্ত চক্ষে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি আগ্রহভরে বলিলেন—"জানিস্ মীনু ! কোথায় মা ? বল্, আজই তাকে টেলিগ্রাম করে দি।"

"কিন্তু—"

মুখের কথা চাপিয়া ধরিয়া বাবা বলিলেন—"বুঝেছি মা ! কিন্তু আমি ডাক্‌লে আবার সে আস্‌বেই। বল মা, কোথায় সে আছে ?"

মুখ নীচু করিয়া ধীয়ে ধীরে বলিলাম—"গিরিডিতে।"

"ঠিক জানিস্ ত ? মুকুন্দ, মুকুন্দ—"

দ্রুতগতিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। মূঢ় আমি, নারী আমি, ইতে সাদা ফ্যাকাশে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, অন্ত-রের ভিতর হইতে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—

বিদায় করেছ যারে—
নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে !

রুদ্ধ আবেগ

থামাও থামাও তোমার ও সুর, ওগো অন্তরের গোপন পথিক! আর তোমার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের ধ্বনিতে আমায় পাগল করিও না।

এই যে নিরলস দিনগুলি চক্ষের সুমুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, ইহাদের কি সুখ? কর্ত্তব্য সাধন করিতেই ইহাদের আনন্দ! বেদনা নাই, ব্যথা নাই, আকুলতা নাই—আছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যপূর্ণ মুহূর্ত্তগুলি!

আচ্ছা, আবার কি তিনি আসিবেন? যে অভিমান, যে অনাদর, যে হতাশ লইয়া তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন সমস্ত ভুলিয়া আবার কি তিনি আসিবেন? যাইবার সময়েও তাঁহার সে শেষ বিদায়-বাণী— "এখানে আসা আমার বোধ হয় এই শেষ।" তবে? তবে? ওগো, কেমন করিয়া আবার—

রন্তুকে টেলিগ্রাম করে দিলুম। মা, দেখিস্, আবার যেন সব হারাস্ নি। জানিস, তোর বুড়ো ছেলের আশীর্ব্বাদ তোদের ঘিরে রাখ্‌বে।

এত বড় অভয়বাণীটার পরও যেন অন্তরটা আমার সুস্থির হইতে পারিতেছিল না, কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছিল—

মধু-রাতি পূর্ণিমার—ফিরে আসে বার বার
সে জন ফেরে না আর
যে গেছে চলে।

ঊনিশ

* * মনীষার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অভাগিনী নারী আজ হইতে এক মহা কর্ত্তব্যের ভারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, সংসারে প্রবেশ করিল। আজ আর সে বালিকা নহে, স্বামীর পত্নী, সংসারের কর্ত্রী!

বাবা বলিয়াছিলেন, বড় খুসী হয়েছি মা তোর কাজ দেখে। আমার মেয়ের এই ত চাই, বিপদে সাহায্য করা, তৃষ্ণায় জল দেওয়া কত বড় পুণ্যের কাজ! কিন্তু মা, একটা বড় ভুল করেছিস্!

ভুল! কৈ, এমন কোন কথা ত মনে হইতেছে না। বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম,—"কি বাবা?"

বাবা হাসিয়া বলিলেন,—"সে ভুল আর কিছু নয় মা! আমাকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছিস্—কিন্তু তা হলেও আজ যে কাজ তুই করেছিস, কি বল্‌বো মা, গর্ব্বে আনন্দে বুক আমার ফুলে উঠেছে! আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন যেন এইভাবে পরের কাজ করে যেতে পারিস্! মীনু, তোর মাকে মনে পড়ে? সেও একদিন ঠিক এমনি ক'রে, আমায় না জানিয়ে, একটা গরীব সংসারকে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছিল।"

"মা আমার, আজ যেখানেই থাক, এ হতভাগীর কাতর প্রার্থনা বাণী তোমার চরণে আশ্রয় লভুক;—তোমার স্মৃতি, তোমার পবিত্রতা আমার এ হীন অন্তরে চিরোজ্জ্বল হইয়া বর্ত্তমান থাকুক্!"

রুদ্ধ আবেগ

আজ কয়েকদিন ধরিয়া বাবার মনটা ভারী প্রফুল্ল দেখাইতেছে। বাবা বলিলেন,—"মীনু, বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যাবি মা, চল্‌, দেখে আসি।"

বলিলাম,—"না বাবা, শরীরটা তেমন ভাল নেই, তুমি বরং যাও।"

"সাবধানে থাকিস্‌ মা, আমি তা হলে ঘুরে আসি, বুঝ্‌লি?"

বাবা চলিয়া গেলেন। গত মাসের পুরাণ মানসীখানা লইয়া বাহিরে ইজি-চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িলাম।

অন্যমনস্কে মানসীর পাতাগুলি লইয়া কতক্ষণ নাড়া-চাড়া করিতে-ছিলাম, মনে নাই, মুকুন্দ আসিয়া খবর দিল, নীচে একটী ভদ্রলোক আমারই অপেক্ষায় না কি বসিয়া আছেন।

"কি রকম তাঁকে দেখ্‌তে মুকুন্দ?"

"বেশ ফর্‌সা রং, পাঞ্জাবী গায়ে, নাম বল্লেন—অরুণবাবু!"

সজোরে আমায় কে যেন একটা ধাক্কা মারিল। এ কি নিষ্ঠুর খেলা তুমি খেলিতেছ দেবতা! যত তাঁহাকে ভুলিতে চাহি, ততই তাঁহার তরুণ সুন্দর মূর্ত্তিখানি আমার চক্ষের সুমুখে ধরিয়া তুমি আমার প্রতিজ্ঞা কল্পনা সমস্ত ভাসাইয়া দিতেছ! কৈ, কোনদিন ত তোমার কাছে অপরাধ করি নাই? তবে কেন আজ এ মহা শাস্তি, ওগো বিরাট দেবতা!

"তাঁকে ওপরে আস্‌তে বল্‌বো, দিদিমণি?"

"না, যাও, আমি যাচ্ছি!"

রুদ্ধ আবেগ

বিষাদ-জড়িত নিরলস-জীবনে আজ একি আধ আলো, আধকালো ছায়া পড়িয়াছে !

ঘরে ঢুকিতেই অরুণবাবু বলিলেন—"ঘরে এস মীনু ! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

"আপনাকে চা দেবো ?"

"চা, হাঁ, তা দিতে পার এক কাপ !"

কাপটীকে মুখে তুলিতে তুলিতে তিনি বলিলেন,—"প্রভাতবাবুর সিঁদুর-কৌটা' পড়েছ মীনু ?"

অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম,—"পড়েছি !"

"মনে পড়ে ? পল সাহেব চা খেতে খেতে সুশীকে কি বলেছিল, সেই যে—"

"আই ওয়াণ্ট নো সুগার ইন্ মাই টী !"

"হোয়েন্ লাভলি সুশী সিট্স্ বাই মী !"

বলিয়াই তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কাণ দুইটা আমার আগুনের মত গরম হইয়া উঠিল, বলিলাম,—"কম হয়েছে কি ?"

"না, মোটেই না।"

অরুণবাবু বলিতেছেন,—"আর তিনমাস মীনু ! তারপরেই টাটায় চলে যাব। আড়াইশো টাকার একটা কাজ সেখানে পেয়েছি। তিনমাস পরেই 'জয়েন' করতে হবে ! কিন্তু তার আগে মীনু, আরও—আরও কাছে তোমায় পেতে চাই।"

হায় রে মূঢ় মানব ! জীবনে যে আশাকে পোষণ করিয়া তুমি

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আগ্রহভরে কাটাইয়া দাও, সে আশার সাফল্যের আলোক কোনদিন তোমার চক্ষে লাগে কি? না, যে অন্ধকারেই তোমার জীবন, আবার সেই অন্ধকারেই তোমার মৃত্যু! অস্ফুটস্বরে অন্তরের সমস্ত বল সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "কিন্তু—"

"কিন্তু কি মীনু? উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে আমি-ই বা তোমার ভার কি ক'রে নেবো, তার ব্যবস্থা আজ পেয়েছি!"

অন্ধ যুবক! আমার গোপন-চিত্তের নিভৃত দেবতা, আজ কোন্ ভাষায় তোমায় বুঝাইব যে, শক্তিহারা, কামনা-হারা নারী আমি, সমস্ত অধিকার আজ হারাইয়াছি।

"মিনতি, কাঁদ্‌ছো?"

"কৈ, না!"

"শোন মীনু, আমি মানুষ হতে চাই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, আর তার জন্যে তোমার সাহায্য চাই আরও বেশী ক'রে। কেঁদ না লক্ষ্মীটী, ঈশ্বর আমাদের এ কাজে সাহায্য করবেন।"

"কে, অরুণ না-কি! বসো বাবা, বসো। এই একটু ঘুরে এলুম!"

বাবা ঘরে ঢুকিলেন, মুখখানি তাঁহার কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। "তারপর খবর কি?"

অরুণবাবু বলিলেন,—"খবর আর সব ভাল, আস্‌ছে মার্চ্চে টাটায় যাচ্ছি, একটা সার্ভিস পেয়েছি,—আয়রণ ফ্যাক্টরীতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার!"

"বাঃ, বেশ, বেশ! —কি রে পাগ্‌লী' অরুকে চা দিয়েছিস্?"

আমাকে উত্তর দিতে হইল না, অরুণবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, তা দিয়েছে! আপনার শরীর ভাল ত?"

বাবা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তা এক রকম ভাল, তবে মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে কিছুতেই স্থির হ'তে পারছিনে, বাবা!"

এ কী মলিন শিথিল ছায়া আসিয়া মুখ ঢাকিয়া দিল, জ্যোতিঃহীন বিরস মুখের উপর এ তীব্র আঘাত তুমি প্রদান করিলে, ওগো সত্য-সুন্দর?

বাবা বলিতেছিলেন—"রন্তু বোধ হয় শীগ্‌গীররই আস্‌ছে মা, ওপরের ঘরটা মুছিয়ে রাখিস্! আর হাঁ, অরুণ তুমিও ক'টা দিন এখানে থেকে যাও না বাবা! 'বিয়ের পরেই—ও কি, উঠ্‌লে কেন বাবা?"

জড়িতস্বরে অরুণবাবু বলিলেন,—"বড্ড মাথা ধরেছে কাকাবাবু, যাই, একবার পিসীমার বাড়ী হয়ে যাব! নমস্কার মিস্ রায়!"

দ্রুতপদে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ওঃ! কি আঘাতই না আজ তিনি পাইয়া গেলেন। প্রিয়তম! দেবতা আমার! ভাবিও না, এ আঘাত আজ শুধু তোমার হৃদয়কেই নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে,—আমারও ক্ষীণ-দুর্ব্বল অন্তরখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগিবে না, বোধ হয় যুগ যুগ ধরিয়া তোমারই মুখের পানে তৃষিত নয়নে তাকাইয়া থাকিয়া অম্লানে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে! শান্তি, সহানুভূতি? ওগো তীব্র কি বিষ, এ ভগ্নপ্রাণে সহ্য হইবে না!

বিশ

পোড়া চক্ষে ঘুম যেন আসিতে চাহে না। এই ত এক দুই করিয়া রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। কোলাহলপূর্ণ সহরখানা ঘুমনকাটির পরশ পাইয়া নীরব নিঝুম হইয়া গেল,—কিন্তু ঘুম কোথায়? ধীরে ধীরে উঠিয়া ছাদে আসিয়া বসিলাম। উপরে "কালো আকাশের বুকে, প্রদীপের মত নক্ষত্রগুলি কেমন দিনের পর দিন আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে। চন্দ্রমা আপনার হাসি অকাতরে পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া দিতেছে! আঃ! কি সুখেই না আছে উহারা? শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, শুধু কর্ত্তব্যপূর্ণ দীর্ঘ দিনগুলির সাথে নিরলসভাবে চলিয়া যাইতেছে!

অরুণবাবু চলিয়া গিয়াছেন,—আজ তিনদিন হইল, রুদ্ধ অভিমানে বক্ষ তাঁহার ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি করিব? ছাগশিশুর হাত-পা বাঁধিয়া হাড়ীকাঠে ফেলিয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা, আজ আমারও তাই! ইচ্ছাশক্তি, স্বাধীনতা সমস্তই আজ হারাইয়াছি।

বাঁশী, নয়? কে, কোন্ বিরহী ওগো এই বিজন-রাতে বাঁশীর সাথে তোমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিতেছ? জগতের আলো হইতে লুকাইয়া থাকিয়া, অন্ধকারে বিজনে তোমার যত্নসঞ্চিত ক্রন্দন-রাশী বাতাসের গায়ে ছড়াইয়া দিতেছে? আহা, বেচারী—বেচারী আমার!

বাঁশীর সুর আরও—আরও করুণ বাজিল—
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে,
কোন্ সাথী মোর যায় যে ডেকে,
একলা-দিনের বুকের মাঝে,
ব্যথার তুফান তোলে।

ওগো ব্যথিত পথিক, থামাও, থামাও তোমার সুর, এ অভাগিনীকে আর পাগল করিও না গো! একি মোচড় খাইয়া তোমার ও সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! ফিরাও, ফিরাও—আঃ! বেশ বাতাস দিতেছে ত!

কুন্তলা বলিয়াছিল,—"ভালবাসা স্বর্গীয় ধন নয় মীনু, পৃথিবীর লোককে কাঁদাতেই ওর সৃষ্টি! ও মানুষেরই তৈরী!

কুন্তী, দিদিটী আমার! আজ এ মহাসমস্যার যে আবর্ত্তনে পড়িয়া পিষিয়া মরিতেছি, তাহা তোকে কি করিয়া জানাইব ভাই। মান সম্পদ সমস্ত ছাড়িয়া শুধু আপনার জিনিষটীকে লইয়া যে দারিদ্র্যকে তুই বরণ করিয়াছিস্, দেখিলেও কান্না আসে, কিন্তু তাহাও যে কত সুন্দর, কত পবিত্র!

মল্লিকদের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল, আর ভাল লাগিল না, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

* * *

সকালে একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই দেখি, হিন্দুস্থানী ঝি লখিয়া, ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসিয়াছে। আমাকে

দেখিতেই উৎসাহ ভরে লখিয়া বলিল,—"দেখিয়ে ত দিদিমণি, এইসা করনেসে, কেইশান কাম্ চলে গা ?"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিল, 'সকাল হইতে একটা লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তাই সে, রাত্রের অবশিষ্ট ভাত ও লুচীগুলি লখীয়াকে না দিয়া তাহাকেই দিয়াছে, তাহাতেই হিন্দুস্থানী-মাগীর এত রাগ ! লখিয়ার রায় শুনিতে হইল ঠিক অন্যরূপ। সে বলিল, 'ভিখারীকে দান করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া তাহার কুষ্টিতে লিখে নাই, তবে লোকটাকে সে না-কি একদিন পুলিশের হাতে দেখিয়াছে, চোর-জোচ্চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া—"

বলিলাম,—"সে কোথায় ?"

ঠাকুর বলিল,—"রোয়াকের সামনেই পাতা পাড়িয়া সে খাওয়া সুরু করিয়াছে।"

আহা, দেখিলেও কষ্ট হয়, যেন কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে খাইতে পায় নাই—এরূপ যত্ন পায় নাই, আজ দুইটা-ই পাইয়াছে, দুইটী চোখ ভরিয়া তাহার দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিষ্ঠুর দেবতা ! জানি না, কি সুখ তুমি পাও এই শীর্ণ ভিখারী লোকগুলিকে যন্ত্রণার নিষ্পেষণে ফেলিয়া।

খাওয়া হইয়া গেলে লখীয়াকে দিয়া তাহাকে ভিতরে ডাকাইলাম। আহা, বড় অভাগা সে, আদর কখন পায় নাই, আজ পাইয়াও কাঁদিয়া ফেলিল। বলিলাম,—"বাড়ীতে কে কে আছে তোমার ?"

"কেউ নেই মা! এই দুদিন আগেও যে আমায় আগ্‌লে পড়ে থাক্‌তো, সে স্ত্রীও কাল মারা গিয়েছে।"

একখানি পাঁচ টাকার নোট তাহার হাতে দিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। এত বড় দান, জীবনে বুঝি সে এই প্রথম পাইল;—এই পাঁচটী টাকা তাহার কাছে পাঁচ সহস্র কিম্বা বুঝি তাহারও অধিক! লখিয়া ঝি গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। চোর ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় অন্যায় কাজ, এবং সে অন্যায় ছেলেমানুষ আমি, না জানিয়া করিয়া ফেলিয়াছি, ইতস্ততঃ তাহারই অনুযোগ করিতে লাগিল!

হায় রে! দান করিয়াও বুঝি কত সুখ আছে! কিন্তু সে সুখের আস্বাদ পায় জগতে কয়জন? আমোদ প্রমোদে রত থাকিয়া, আলস্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ঢালিয়া কয়জন সে আস্বাদ লাভের অধিকারী হইতে পারে? সেই দানের গরিমায় বুকখানি আমার তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। আঃ!

পাশের দরোয়ানদের ছোট ঘরের ভিতর হইতে একটা বেশ মিঠা গলার আওয়াজ আসিয়া কাণে বাজিল। বুঝিলাম, কেহ গান গাহিতেছে—

—ঠবরি ঠবরি করি কিছু না পাওয়ে
কৈঁইসে নিঠর কালা বংশী না বাজাওয়ে,
অমানিশা সখি পিয়ারা পিয়ারে—
আজি কৈঁইসে (হায়) নিশি পোহাল—

গায়ক তরুণ, একটী আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, কোন বাদ্য-যন্ত্র না থাকিলেও তাহার মিষ্ট গলার গানটী ভারী চমৎকার লাগিতেছিল! আঃ, ইহাদের সঙ্গীতের প্রতি সুরে, প্রতি ছন্দে সেই ভাব, গোপীদিগকে আপনার প্রেমে মজাইয়া নিষ্ঠুর দেবতা যে ছলনা করিতেছেন, তাহাতে অস্থির হইয়াই ব্যাকুলা নারীরা কাতর প্রার্থনা করিতেছে! ওগো, বাজাও তোমার বাঁশী, যাহার প্রতি ঝঙ্কারে সর্ব্বস্ব ফেলিয়া আমরা তোমার অনুগামী হইয়াছি! কি করুণ সুর! আহা, শুনিলেও প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

*　　*　　*　　*

যমুনা কি গাগরী, কেঁইসে হামারি,
আজু সে তুয়ারি করিনু আপনারি,
গোলোকবিহারী—হরে মুরারী
গোপীগণরঞ্জন মন মজাইয়ে!

কে ওগো অবোধ যুবক, আবার আমার প্রাণে উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিতেছ? এই ত সমস্ত ভুলিয়া—না না, ওকি বুঝিবে সে ব্যথা অশিক্ষিত সরল-প্রাণ যুবক!

"মীনু!"

"কে,—বাবা?"

বইখানি হাতে লইয়া বাবা ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন—

"না মা, রণেনের কোন খবর পেলুম না, গিরিডি থেকে তারা চিঠি লিখেছে—এই দেখ্ না; রণেন ওখানে মোটেই যায়-নি

তবে লিখেছে যে, কবে যাবে তার ঠিক নেই, বিশেষ কাজে একটা জায়গায় গেছে ! কাল তোর স্কুল খুল্‌বে, না ?"

অন্তরটা যেন আমার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিলাম, হাঁ বাবা, গাড়ীটা ঠিক রাখতে বলো।"

একুশ

সীটের উপর বিছানা-পত্র গুছাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, নোটীশ বোর্ডের উপর কালো বর্ডার দেওয়া একটা নোটীশ মারা, আর তাহা ঘিরিয়া প্রায় ডজন তিনেক মেয়ে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। নোটীশটায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

অদ্য বুধবার শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বিভা সেনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল বন্ধ থাকিবে এবং বৈকালে একটী শোক-প্রকাশক মিটিং বসিবে ! সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রতিমা বলিল,—তা হলে আজ বন্ধ ? দূর, এ জান্‌লে আমি কখন এত আগে আসতুম ?

চামেলী বলিল,—কেন, Condolenceএ অ্যাটেণ্ড কর্‌বি না ?

প্রতিমা বলিল, না ভাই, ও-সব অ্যাটেণ্ড ফ্যাটেণ্ড আমার দ্বারা হয় না !"

মীনু-দিদি যাবে ত ?

প্রতিমা আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।

বলিলাম—নিশ্চয়ই যাব। প্রীতি, এই বিভা-দিদি আমার কম উপকারটা করেছিলেন? সেই সেবার একজামিনের সময় আমি আর কুন্তলা যখন ওঁকে গিয়ে ধর্‌লুম যে, ইংলিশ আমাদের একেবারে তৈরী হয় নি, সারা দিন, সারা রাত খেটে আমাদের পড়িয়েছিলেন।

"আর সে জন্যে একটা রিষ্টওয়াচও পুরস্কার পেয়েছিলেন বোধ হয়।"

বলিলাম—"না প্রীতি, এ কথা একেবারে ভুল, সে রিষ্টওয়াচ উনি নে'ন নি, তিরস্কার করে ফেরৎ দিয়েছিলেন।"

আহা, আজ এই একটী করুণ-ব্যথার সহিত কত স্মৃতিই না জাগিয়া আছে! বিভাদির কথা মনে পড়িলেও দুঃখ হয়। আহা, দুঃখিনী নারী সে! বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর তাঁর স্বামীটী বাঁকিয়া বসিলেন—মেয়ে পছন্দ হয় নাই! ইস্, কি নিষ্ঠুর এই পুরুষ-জাতটা গো! মেয়েদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে ইহারা কত ভালবাসে, যেন তাহার মূল্য নাই!—স্রোতের ফুল! যদি আশ্রয় না-ই দিলে, তবে ওগো নিষ্ঠুর যুবক, কি অধিকার তোমার ছিল, একটী অবলার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পরিহাস করা? তাহার ইহকাল-পরকাল নষ্ট করিয়া দিবার অধিকার কে তোমায় দিয়াছিল? মূঢ় ভ্রান্ত ওগো পথিক, ক্ষান্ত কর তোমার এ দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারপূর্ণ চলাকে! থামিয়া যাও।

মনে পড়ে, বিভা-দিদি একদিন বলিয়াছিলেন—"নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়তে শেখ মেয়েরা সব। পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে একূল ওকূল—ছকূল হারিও না, আগে নিজের চেষ্টা বলকে কাজে লাগাও, পরে অপরের কাছে সাহায্য নি-ও!"

আজ বুঝিতেছি, সে কথার মূল্য কত? মানুষ পৃথিবীতে থাকে, তখন তাহার কথার মূল্য কোথায়? লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, কিন্তু যখন সে লোকের হাসি বিদ্রূপের বাহিরে যায়, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দূর অনন্তের উদ্দেশে চলিয়া যায়, তখন মানুষ তাহার কথার মূল্য বোঝে, জানে, অনুতাপ করে। এই বিভা-দিদির কথা একদিন আমরা হেলায় কতই না উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ? তাহারই অনুশোচনায় দিন রাত্রি মরিয়া যাইতেছি যে গো! বিভাদিদি, দিদিটী আমার! সহস্র নতি আজ তোমায় এখান হইতে করিতেছি, লইয়া ধন্য কর।

"মীনু-দিদি, কাঁদছো না-কি?"

"দূর পাগলী, কাঁদ্তে যাব কোন্ ছুংখে? আচ্ছা প্রীতি, বিভা-দিদির memorial একটা কিছু কর্‌লে হয় না? কি বলিস ভাই?"

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"তা বেশ হবে মীনু-দিদি, সত্যি বল্‌ছি, তারই একটা বন্দোবস্ত করো।"

কিন্তু কে করিবে? হায় রে! হাঁ, এক করিতে পারিবার মত উদ্যমী উৎসাহী যদি কেহ ছিল ত কুন্তলা! কিন্তু সে-ও যে আজ

কতদূরে—হয় ত বিভা-দিদির মৃত্যু-কাহিনী এখনও তাহার কানে যায় নাই।

প্রতিমা বলিল—"আচ্ছা, একটা কাজ কর্‌লে হয় না মীনু-দিদি?"

"কি ভাই?"

"ধর, এই Condolence meetingএ তুমি যদি একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে আমাদের ইচ্ছেটা সকলকে জানিয়ে দাও!"

মনে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া দেখা দিল, বলিলাম, ছিঃ ভাই! অতগুলি শিক্ষক, মেয়েরা—"

"তাতে কি হ'য়েছে? সে ত সকলেই দেয়! আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি, যা যা বল্‌তে হবে। তুমি শুধু পড়ো, কেমন?"

প্রতিমা চলিয়া গেল সেইখানে দাঁড়াইয়া অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের অলস উদ্দেশ্যহীন মেঘগুলির দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ইস্‌! এই ত জগতের গতি! কাল যাহার হাস্যচপল মুখ দেখিয়া মানব হাসিয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেও আজ তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না!

আহারের পর প্রতিমা সহসা ঘরে ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আরোও পাঁচ ছয়টা মেয়ে ঢুকিল। প্রতিমা একখানি কাগজ আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"নে ভাই, পড়ে দেখ।"

বলিলাম—"তুই পড়্‌ প্রীতি, শরীরটা বড় খারাপ লাগ্‌ছে।

প্রতিমা পড়িতে লাগিল—

"দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বেশ নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্য

দিয়ে চলে যায়—কিন্তু তার মধ্যেও কখন যে বিষাদ-জড়িত একটা কালো আঁধার এসে দেখা দেয়, কেউ জানেও না, চির উৎসবময় প্রাসাদেও কখন যে দুঃখ দৈন্য এসে পড়ে, কেউ কল্পনায়ও আন্‌তে পারে না। সহসা অচেনা—অজানার মধ্যেই তার সৃষ্টি! আজ আমাদের কাছেও সেই রকম একটা ভয়ানক দিন এসে পড়েছে! শ্রদ্ধেয়া শিক্ষয়িত্রী—যিনি একাধারে আমাদের বন্ধু, উপদেষ্টা ব'লে অভিহিতা ছিলেন, আজ কালের নির্ম্মম পেষনে তাঁকে এই ছোট্ট কুটীর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে চলে যেতে হয়েছে! কিন্তু তাঁর স্মৃতির জন্যে—তাঁরই ছাত্রী, ভগ্নী আমরা—কিছুই কি কর্‌তে পারি না? আমি চাই, যাতে তাঁর আত্মার কল্যাণ হয়, যাতে সুদূর অন্তরালে বসেও তিনি দেখ্‌তে পান—তাঁর অভাব আমাদের কতদূর মর্ম্মাহত করেছে! সারা জীবন ধ'রে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি আমাদের জন্যে যে শ্রম কষ্ট বহন করে গেছেন, আমরা চাই তাঁর ব্যথিত তপ্ত চিত্তে একফোঁটা শান্তিজল দিতে—সে গুরু ভারকে লাঘব ক'রে দিতে! কিন্তু ভগিনীগণ! সে শান্তি পেতে হলে, তাঁরই একটা স্মৃতি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য!

আমাদের ইচ্ছা, স্কুলের এই কম্পাউণ্ডে তাঁর একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি খোদিত ক'রে রাখা হউক, যাতে প্রতি নিমেষে, প্রতি কার্য্যে তার শান্ত সরল মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আমরা চল্‌তে পারি!

আশা করি, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া

আমাদের সকলকেই এ কর্য্যে উৎসাহ প্রদান ক'রে আমাদের উত্তমকে আরও শক্তিশালী ক'রে তুল্‌বেন। আমাদের স্থির দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁদের উৎসাহ পেলে আমরা আরও শীঘ্র এই কার্য্যে নাম্‌তে পারবো!"

প্রতিমা চুপ করিল। হাসি বলিল,—"সত্যি ভাই প্রীতি, তুই কবিতা লিখিস্ না কেন, বল্ তো?"

"তুই ছাপাবি! ছাপাস্ তো বল্?"

হাসি হাসিয়া বলিল,—"দূর্, আমি কেন ছাপ্‌তে যাব? তোর বিয়ের সময় তুই নিজেই ছাপাবি!"

প্রতিমা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"পড়্‌বে ত মীনু-দিদি?"

তা' ত পড়্‌বো, কিন্তু সকলে যদি হাসে ভাই? হয় ত বল্‌বে— তোর কেন মাথা ব্যথা বাপু! তখন?"

প্রীতি গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ও-সব কথায় কান দিও না মীনু-দিদি, তুমি শুধু এটা পড়ে যাবে। নাও, উঠে পড়, চারটে বাজে যে!"

প্রতিমা চলিয়া গেল। হা রে অভাগী! আজ তোর মত যদি সকলেরই মন হইত? কুন্তী, দিদিটী আমার! একদিন এই স্নেহ, এই প্রীতি দিয়াই তুই এ অভাগিনীকে জড়াইয়া গিয়াছিস্—আজ এ আবার—কে, প্রীতি? চল ভাই, যাচ্ছি!

শান্তি, শান্তি—ওগো এ তপ্ত অন্তরে আজ শান্তি দাও প্রভু!

বাইশ

সকালবেলা উঠিয়া আলস্য-জড়িত চক্ষে বিছানার উপর বসিয়াছিলাম, অন্তরের মধ্যে গত রাত্রের শোক-সভার দৃশ্যটা বেশ স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সহসা ঝি আসিয়া একখানি চিঠি দিল, উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—মিস, এম্ রায়। চিঠি খুলিতেই দেখিলাম, অরুণবাবু লিখিয়াছেন :—

মিনতি !

আজ তোমাকে যে সম্ভাষণ করলুম, জানি না, তার অধিকার আমার আছে কি-না? যদি দোষ হয়ে থাকে, মার্জ্জনা চাইছি; কিন্তু তা'র আগে একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

আচ্ছা, মানুষকে জ্বলিয়েই কি তোমাদের সুখ মিনতি? তার সুখ, তার আশাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিষ্ফল ক'রে লাভ কি তোমাদের, বলতে পার? কি জানি, মনে হয়, পুরুষের চোখের জল না দেখলে নির্ম্মম তোমরা, তোমাদের শান্তি হয় না!

কলিকাতা ছেড়ে আমি টাটায় এসেছি। কিন্তু কেন বলতে পারি না, সে আশাও আমার ব্যর্থ হয়েছে; যেহেতু, তোমার মূর্ত্তিকে এখনো আমি ভুলতে পারি নাই; আর যতদিন তা না পারবো, ততদিন আমার শান্তি নাই, পলে পলে জ্বলে মরতে হবে! উঃ, কি নির্ম্মম তোমাদের প্রাণ মিনতি? মনে হলেও কেঁপে উঠি।

একদিন রাতে তন্দ্রা যখন তার মৃদু পরশ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, যখন তার স্নিগ্ধ বাতাস আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন মনে হলো,—মিনতি, তুমি এসেছ, আবার তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ। উঃ, সেটা যদি সত্যি হ'ত মিনতি? তার সৃষ্টি যদি বাস্তব জগতে হ'ত, তা হলে?—না থাক্, আর তোমায় বিরক্ত কর্‌বো না।

এখানে এসে অবধি শরীরটা ভাল নাই, কেমন একটা অস্বস্তি, কেমন একটা ম্যাজ্‌মেজে ভাব সর্ব্বদা আমার মনে হয়। আচ্ছা মিনতি, ভালবাসার মধ্যে কি কিছু অভিশাপ আছে? আমি ত তোমায় প্রাণ ভ'রে ভালবাস্‌তুম্, তোমাম স্মৃতি আমার সমস্ত কাজ ফেলে মাথা উঠিয়ে থাক্‌তো, আর মূঢ় আমি, মাঝে মাঝে মনেও হতো যে, হয়ত তোমায় পাব। কিন্তু সমস্ত আশা-ভরসা আমার ভেঙ্গে গেল সেইদিন,—যেদিন তোমার বাবা আমার কাছে তোমার অন্যের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব তুল্‌লেন। কি-জানি, আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না মিনতি! তাই আজ পাগলের মত যা তা' বকে চলেছি! আশা করি, ভাল আছ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও।

ইতি—হতভাগ্য

অরুণ।

চিঠি হইতে মুখ তুলিতেই দেখি, শান্তি মশারীটা খুলিতে খুলিতে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না,
শুক্‌নো ধূলো যত, কে জানিত
আস্‌বে তুমি গো
অনাহুতের মত—

দেবতা আমার! এ কি তিরস্কারপূর্ণ তীব্র বাণী তোমার, আজ আমার কাছে পাঠাইয়া দিলে? ইহা ত আমি ভাবি নাই, আশা করি নাই, কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই,—তবে? কিন্তু এ বিচ্ছেদ, উভয়ের মধ্যে এ ব্যবধান কে করিয়াছে, কে জানে? তাহারই শত ঘায় হৃদয় আজ আমার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

"মীনু-দিদি, মুখ ধুতে যাবে না?"

তাই ত! এতক্ষণ বসিয়া করিলাম কি? সমস্ত মেয়েই ত মুখ ধুইয়া আসিয়া আপনার আপনার কাজে মন দিয়াছে,—আর আমি? ছিঃ, একি দুর্ব্বলতা আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিল গো!

মুখ ধুইয়া আসিতেই সেভেন্থ ক্লাশের যে ছোট্ট মেয়েটী কয়েকদিন হইল বোর্ডিঙে আসিয়াছে, আমায় বলিল,—'একটু পড়া ব'লে দেবেন?'

চোখ দুইটীতে বড় করুণ অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টি। বলিলাম,—"বেশ ত, বই নিয়ে এসো। তোমার নাম কি?"

"নাম? আমার নাম—মঞ্জুলা।"

"মঞ্জুলা! বাঃ, বেশ নাম তো? তোমাদের বাড়ী কোথায় খুকী?"

"বাথোরে !"

প্রতিমা মুচকাইয়া হাসিয়া বলিল—"বাথোর ! সে কোথায় ? পাথর টাথোর-আলা দেশে নয় তো ?"

মেয়েটী তেমনি করুণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"না, হাওড়ায় ।"

"তোমার কে কে থাকেন সেখানে, মঞ্জুলা ?"

মঞ্জুলা আমার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বলিল—"মা' দিদি আর দাদা ।"

প্রতিমা ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর বাবা ?"

মঞ্জুলা বলিল—"না, বাবা থাকেন না, তিনি কোথায় থাকেন, তা-ও আমরা জানি না । মা মাঝে মাঝে কাঁদেন, কিন্তু বাবা আর ফিরে আসেন না ।"

হা রে অভাগী, চোখের দুই ফোঁটা জলেই যদি সংসারের কাজ হইয়া যাইত, দূর হইতে আপনার প্রিয়টীকে কাছে টানিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে সকলেই কাঁদিত, কিন্তু তাহা যে হয় না ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু গলিয়া যাইলেও নিয়মের--অদৃষ্টের ব্যতিক্রম হইবে না ! সে যে বড় কঠোর, নির্ম্মম গো !

বিকালবেলা তখন, খেলিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, দরোয়ান আসিয়া হাজির । "দিদিমণি না-কি আমাকে বোলাইয়াছেন ।" মণিকা-দিদির কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন—"তোমার লোক এসেছেন মিনতি, তোমার বাবার বড় অসুখ, তোমায় বাড়ী যেতে হবে !"

বাবার অসুখ! বুকটা কে যেন আমার দোলা দিয়া দিল, বাহিরে মুকুন্দ দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

"মোটর এনেছি, শীগ্‌গীর করে।"

এ কি দুঃসংবাদ ধূমকেতুর মতই সহসা আমার শীর্ণ বুকে আসিয়া ঘা দিল!

তেইশ

বাড়ীতে আসিয়াছি আজ আট দিন, এই আটটী দিনের মধ্যে বাবার শরীরের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে সহসা একটা ভয় মান জাগিয়া উঠে। চক্ষের কোলগুলি বসিয়া গিয়াছে, তাহারই চারি পার্শ্বে একটা কালো-দাগ যেন মৃত্যুর দূত হইয়া জমকিয়া বসিয়াছে। বিপদের সাহায্য করিবার, রোগে শুশ্রূষা করিবার দ্বিতীয় প্রাণীটী আর নাই। বাড়ীতে সাহায্য করিবার মাত্র একটী লোক—মুকুন্দ। দরোয়ান—তাহাকে কখন ডাকিয়া পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না।

ডাক্তার বলিয়াছেন,—রোগ না-কি তেমন সহজ নহে, সাবধানের সহিত শুশ্রূষা চাই, কিন্তু কি করিব?

রণেনবাবু কি আর আসিবেন? ছিঃ, একবার যাঁহাকে হেলায় উপেক্ষা করিয়াছি, আবার তাঁহাকে কি করিয়া আহ্বান করিব?

ওগো, সে যে বড় অভিমান করিয়াই চলিয়া গিয়াছে,—আমার অন্ধকারাবৃত অজ্ঞানতার নির্ম্মম আঘাতে কত আঘাত বেদনাই যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে,—নারী আমি, সে আঘাতের মূল্য কি বুঝিব? হা রে অভাগী! আজ উপেক্ষিতকে আহ্বান করিতেই তোর এত আগ্রহ, এত অনুতাপ!

নীচে উঠানে বসিয়া একটা হিন্দুস্থানী যুবক কাপড় শুকাইতে দিতে দিতে গাহিতেছিল,—

জনম অবধি হাম,
রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল—

হায় রে মূঢ় যুবক! এত তৃষ্ণা আশা লইয়া তুমি কোথায় যাইবে? সমস্তই যে তোমার বুকে জমাট বাঁধিয়া সারা জনম ভরিয়া কাঁদাইবে, অমন আকুল চক্ষু তোমার তৃপ্তিলাভ হইতে পারিবে না! তবে? কেন মিছে এ নিমেষের কান্নাকে ডাকিয়া আনা? এ বুক-ভাঙা সুরকে কেন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তুলিয়া দেওয়া? হাঁ, তবে ইহাতেও যে সুখ নাই, তাহা নহে।—

এই পথ চাওয়াতে[illegible]!
খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া,
বর্ষা আসে বসন্ত।

এই পথ চাহিয়া চাহিয়াই এই আকুল উদ্বেগভরা চক্ষুর সম্মুখে

দিয়া গ্রীষ্ম বর্ষা—এমন কি, ছয়টী ঋতুই ব্যর্থতার বোঝা লইয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু সে পথ-চাওয়াতে আনন্দের অভাব নাই।

বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন। বেচারী মুকুন্দ তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছে। আহা, বেচারীকে দেখিলেও দুঃখ হয়। উহার না আছে বাপ, না আছে মা, সংসারে কেহই নাই!

"চুপটী ক'রে ব'সে কা'কে ভাবছো ভাই মীনু দি্দি?"

চমকিত হইয়া পেছন ফিরিতেই দেখিলাম,—প্রতিমা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

"একি, তুই যে? আর সব কোথায়?"

প্রতিমা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—যা ডিউটীফুল দরোয়ান রেখেছ, আর সব আস্‌বে কোত্থেকে বল? আমিই-যা মিশির ঠাকুরের—"

"দূর রাক্ষুসী, চল, দেখি সব কোথায়?"

প্রতিমার সহিত নীচে নামিয়া আসিতেই দেখিলাম—বাহিরে "বাস' ভরা মেয়ে! দ্বারের উপ্পর টুলখানিতে বসিয়া মিশিরজী খইনী টিপিতে টীপিতে সহিসকে উপদেশ দিতেছিলেন যে, আজকাল ডাকুলোকের এত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে যে, জেনানালোক-দিগকেও বিশ্বাস নেই। বুড়া লোক সে, এ বাড়ীর অনেক নিমক খাইয়াছে, অন্যায় হইতে দিতে রাজী সে মোটেই হইবে না।

মেয়েদের উপরকার ঘরে বসাইলাম। মনে পড়ে, আর একবার

একদিন সকলে আমাদের বাটীতে আসিয়াছিল, তাহাদের কর্ত্রী হইয়াছিল—কুন্তলা।

অনেক্ষণ পরে প্রতিমা বলিল—"এবার আমাদের আসল কথা-টাই হো'ক। কি বল সব?"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, সার্টেনলি!"

প্রতিমা একখানি খাতা সম্মুখে ধরিয়া..বলিল—"নাও ভাই, একটা সই ক'রে দাওতো?"

"কিসের সই, প্রীতি?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—ভয় নেই মীনু-দিদি, হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়ে নিচ্ছি নে! বরং আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এ কার্য্যের নেতা তুমি নিজে হয়ে—

"ও! দে ভাই, সই করে দি'!" এত লজ্জা হইতেছিল আমার—ছিঃ!

প্রতিমা সহসা বলিয়া উঠিল—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, নয় মীনুদি'?"

কেন বল্‌তো, কম হয়েছে? দে ভাই, আরও লিখে দি'!

"না না, সত্যি বল্‌ছি মীনু দিদি, দুশো' টাকা তুমি একা দেবে, এ আমরা কেউই আশা করি নি!"

হাসিয়া বলিলাম—"না প্রীতি, আরও পঞ্চাশ জমা করে নাও কুন্তলার নামে, বুঝলে?"

চামেলী বলিল—"মঞ্জুলী কত দিয়েছে, জান মীনু দিদি? সে ত' পাঁচ টাকা দিয়েছে!"

"আঃ, ইহাদের দেখিলেও শান্তি হয়! ইহাদের কি বলিয়া আজ ধন্যবাদ দিব গো! কি শিক্ষার জন্য আজ ইহারা আসিয়াছে? যে শিক্ষার পরিচয় আজ ইহারা স্বেচ্ছায় প্রদান করিল, তাহার কাছে এ শিক্ষা যে কত হীন!

প্রতিমা বলিল—"তুমি চলে আস্‌বার পরদিনেই নীনু-দিদি, ইনস্‌পেক্ট্রেস এসেছিলেন। তিনি বল্‌লেন—" এ ধারণা যার মাথায় ঢুকেছে, এ ইচ্ছা সাফল্যে পরিণত কর্‌তে যার প্রথম উদ্যম ও চেষ্টা দেখা গিয়েছে, আমি তাকে দেখ্‌তে চাই। আজ সে আমারও বরেণ্য! কিন্তু যখন শুনলে যে, তুমি চলে এসেছ, বেচারীর মনটা বড়ই মুষ্‌ড়ে গিয়েছিল।"

বলিলাম-—"কিন্তু এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয় ত প্রীতি, এতে যে তোরও দাবী আছে ভাই?"

"না ভাই, সম্মান তোমার একলা নীনু-দিদি! তুমি না চেষ্টা কর্‌লে আমার ইচ্ছে হয় ত মনেতেই থেকে যেত, কাযে আর তা হয়ে উঠ্‌তো না! "কষ্ট যার, কেষ্ট তার'—কি বলিস, মঞ্জুলী?"

প্রতিমা মঞ্জুলীর গাল টিপিয়া ধরিল।

"কুন্তলার আর কোন খবর পেয়েছিস্‌, ভাই?"

"না প্রীতি, সেই যে একখানা চিঠি ছ'মাস আগে দিয়েছিল, তারপর আর পাইনি! আহা, থাক্‌, হতভাগিনী সে—যদি সুখেই থাকে, তাই-ই থাক্‌! আহা, বড় গরীব? শোভা আসে নি কেন রে?"

প্রতিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তা বুঝি জান না, ওর যে বিয়ে! বিদেশে গিয়েছে!"

"শোভারও বিবাহ? পাত্র কেমন জানিস্?"

"না ভাই, তা অতশত জানিনে, তবে হাঁ, ভাল ঘরে পড়েছে, সেই ভাল।"

মঞ্জুলা বলিল—"স্কুলে কবে যাবেন, মীনু-দিদি?"

একটা কৃত্রিম ধমক দিয়া বলিলাম—"যাবেন কি? বল, যাবে?"

অপরাধীর মত থতমত খাইয়া, ম্লানদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সভয়ে বলিল—"স্কুলে কবে যাবে মীনু-দিদি?"

দুই হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"এখনও দেরী আছে ভাই, বাবার অসুখ করেছে কি-না, আগে সেরে উঠুন, তারপর যাব।"

চামেলী বলিল—"তোমার জন্তে 'ওর' যা মন কেমন করে! সত্যি মীনু-দিদি, তুমি ভাই, যাদু জান, নয়?"

মুকুন্দ ডাকিল—"দিদিমণি! 'বাবু' ডাক্ছেন?"

"যাই মুকুন্দ। তোরা ভাই একটু বোস্, আমি আসছি!"

বাবার কাছে আসিতেই তিনি বলিলেন—"একটু আগে কিছু বল্ছিলি মা?"

"হাঁ বাবা, সেই যে মেমোরিয়াল হবে বলেছিলুম,—তার টাকাটা—"

বাবা হাসিয়া বলিলেন—"পাগ্‌লী আর কি! সে কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌বার কি দরকার ছিল মা? দিলেই পার্‌তিস্। কত নিবি?"

একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—"আমি দুশো সই করেছি, আর কুন্তীর জন্যে পঞ্চাশ করেছি বাবা!"

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাবা বলিলেন—"তা বেশ করেছিস, আহা, বড় দুঃখিনী সে,—নিয়ে যা টাকাগুলো।"

তাহাদের বিদায় দিয়া বাবার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম!

চব্বিশ

কিন্তু দিন যে আর কাটিতে চাহে না! প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত্ত—যেগুলা পূর্ব্বে বায়োস্কোপের ছবির মত নাচিতে নাচিতে চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত, আজ জীবনের এই দুর্য্যোগে এ কি দীর্ঘ অলস যুগের মত আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া?—আর যে পারি না দেবতা! দাও, একটী নিমিষে—একটী পলকে এ অলসতা ভাঙিয়া দাও গো!

কিন্তু সে কি আর আসিবে?—কে জানে, হয় ত বৃথা নয়নের জল ফেলাই সার হইবে। যাহার প্রতীক্ষায় ভগ্ন, জীর্ণ, আহত এ জীবন লইয়া পথের দিকে তাকাইয়া আছি, সে পথ হয় তো রুদ্ধ হইয়া যাইবে, নয়নের দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া আপনি-ই লুটাইয়া পড়িবে! পথ

চাহিয়া থাকার যে আনন্দ, সে আনন্দ হয় তো কোন দিন আমার নিকট পৌঁছাইবে না!

বাবার শরীর সম্পূর্ণ সারে নাই; তবে ডাক্তারের আশা দিয়াছে, জীবনের কোন ভয় নাই। তাহাই হউক ভগবান, তাহার আশাকে সফল করিয়া গড়িয়া তোল,—আর কিছুই চাহি না। জীবনে ছায়া-পথের মত, অন্ধকারে আলোক-রেখার মত, সীমাহীন সাগরের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের মত যাহার আশ্বাস, সান্ত্বনা, যাহার স্নেহ আমাকে ঘিরিয়া আছে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ, দেবতা!

আকাশের মুখে আজ হাসি নাই, আলো নাই, বিধবার মত ক্ষীণ ম্লান! বাতাস আজ রুদ্ধ, বেদনার রাশি বহিয়া লইবার ক্ষমতা হয় তো তাহার নাই! ধীরে ধীরে কালো কালো মেঘগুলি আকাশের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে; নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মত এ কি তীব্র আচরণ গো! এ বাধা মানে না, বারণ মানে না, দস্যুর মত এ কি নিষ্ঠুরতা? আকাশের মুখে কালিমা মাখাইবার এ কঠোর প্রয়াস তাহার কেন গো?—কে জানে, হয় তো একটা সূচীভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক ডুবাইয়া দিবে?—আকাশের সে নির্ম্মল পরিস্ফুট হাসি, তাহার মুখের সে সুন্দর আলো, কে জানে আবার ভাসিয়া উঠিবে কি না? নির্ম্মম নিষ্ঠুর ওগো দুর্জ্জয় দেবতা! আজ এ রুদ্র-দূতগুলিকে ফিরাইয়া লও গো!

আমার অন্তরাকাশেও আজ ধীরে ধীরে এ কি আঁধারের সৃষ্টি সুরু করিয়াছে গো! নির্ম্মম হে মোর অদৃশ্য দেবতা! এ কি

করিলে? শ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া আইসে, চক্ষের দৃষ্টি যে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কাল-বৈশাখীর মত প্রলয় ঝঙ্কার এ কি রুদ্র-মাতন সুরু করিয়াছ? দাও, একটী নিমেষে, একটী আঘাতে সমস্ত কালিমা দূর করিয়া দাও! সেই আঘাতে সমস্ত বেদনা আমার টুটিয়া যাউক!

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, উঠিলাম। কিন্তু কি করিব,—কোথায় যাইব? প্রতি পদক্ষেপের সহিত তাঁহার মূর্ত্তিটা যে ভাসিয়া উঠে! পা থামিয়া যায়, নড়িবার শক্তি থাকে না! সে স্মৃতিটা ভুলিতে পারিতেছি কৈ? কর্ম্মের ভিতর দিয়া সে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, নিদ্রায় স্বপ্নের উপর ভাসিয়া উঠে—শত বাধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তো তাহাকে কিছুতেই আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিতেছি না!

সকাল হইতেই মনটা এত মুষড়াইয়া গিয়াছিল, কিছুই ভাল লাগে না। ধীরে ধীরে অর্গানটার কাছে গিয়া বসিলাম। কি জানি, সঙ্গীতের সুরের মাঝে ব্যাকুল অন্তরের উদ্বেগটা যদি মিশাইয়া যায়, চিন্তাটা যদি ডুবিয়া যায়, তাহারই আশায়! কিন্তু সঙ্গীতের সে সুর আসে কৈ? হাত যে কাঁপিয়া উঠে, কণ্ঠ যে কোন এক অদৃশ্য শক্তি চাপিয়া ধরে। অতি কষ্টে অর্গানে সুর দিয়া বাজাইতে লাগিলাম, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠিল আমারই অজ্ঞাতে।—গম্ভীর অথচ উদাস সে ধ্বনি ধ্বনিয়া উঠিল—

রুদ্ধ আবেগ

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর—আবার কেন প্রদীপ জ্বালো,

রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে,

উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাব না লো!

অন্তহীন—সীমাহীন আকাশের কোলে কয়েকখানি মেঘ মিশ খাইয়া উঠিতেছিল, আঁধারজড়িত একটা আকুল পবন পথহারা শিশুর মত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে; কোথায়, কোথায় তাহার আবাস, কে দেখাইয়া দিবে? সঙ্গীতের সে সুরটা যেন তাহার সমব্যথীর মত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া চলিতেছিল, সে প্রতিধ্বনি ভাসিয়া উঠিল—

সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা, সাঙ্গ আমার বেচা কেনা,
এসেছি ক'রে হিসেব নিকেশ, যাহার যত পাওনা দেনা,
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি, ওমা কোলে তুলে নে' না—
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—
মিশেছে ঐ অসীম কালো!

বাতাসের বুকে সুর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু বুকের মধ্যে আজ এ তীব্র আঘাত কেন গো? সুর ভুল হইয়া যায়, স্বর থামিয়া যায়, অন্তরের যে তীব্র-বেদনাটা, যে চিন্তাটা তুলিবার জন্য এত কঠোর প্রয়াস, সেটা ত কৈ মুছে না, বরং আরও

স্পষ্ট হইয়া চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে! চক্ষু জ্বলাইয়া দেয়, দূর কোন এক কল্পনাকাশে ধীরে ধীরে একটী ছবি ফুটিয়া উঠে! সে ছবি কত সুন্দর, আশাতীত! কিন্তু এ কী করিলে নির্ম্মম দেবতা? তাহার ভিত্তি বাস্তব জগতে স্থান হারাইয়াছে যে! ধীরে ধীরে চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, সে কোন এক বিজন বেলাতট! ঠিক এমনি সে এক বাদল সন্ধ্যায় সমুদ্রের বেলাতটে তাঁহাকে কাছে পাইয়াছিলাম। কৈ, সে সময় তো মুখ ফুটে নাই, সমস্ত ভাষা হৃদয়ের আকুলতাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, নির্জ্জন সে বেলাতটে আর কেহ ছিল না, হতভাগিনী আমি, তাঁহার বুকের কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম। সে কী আকুলতা বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল,—সে-কী ব্যাকুল উদ্বেগ! 'উঃ, সে দিনটা, সে ক্ষণিকটা কি গো একবারও ফিরিয়া আসিতে পার না? অনুতপ্ত মর্ম্মাহত এ জীবনে কী এক বিন্দু শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পার না? বৃথা, আর কি তিনি আসিবেন? যে অনাদর—যে উপেক্ষা লইয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া আবার ফিরিবেন গো?'

এ কী, গান থামিয়া গিয়াছে? ছিঃ, কখন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছি, হুঁস নাই! রীডগুলির উপর আঙ্গুল দিয়া কতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়াছিলাম, মনে নাই! সহসা কে ডাকিলেন—"মীনু?"

এ স্বর যে বড় প্রিয়, বড় পরিচিত গো!

পঁচিশ

বাবা বলিতেছিলেন—আর বোধ হয় আমি বাঁচবো না মীনু! কতদিন তন্দ্রায় দেখেছি, তোর মা এসেছেন; আমাকে বার বার ক'রে বল্‌ছেন—'মুহূর্ত্তের বশে একটা মহা ভুল করে বসো না, মিনা আমার যাতে সুখী হয়, তাই করো!—বল্ মা মীনু, কি কর্‌লে তুই সুখী হোস্—আজই আমি আমার এই পঙ্গু জীর্ণ হাড় নিয়ে তা কর্‌বো, বল্ মা?

কি উত্তর আমি দিব গো! মা-আমার, তোমার কন্যায় সুখের জন্য তুমি লালায়িত হইয়াছ, কিন্তু সে যে বহু দূরে মা! কৈ, এই ত এতগুলি দিন চলিয়া গেল, কাহারও ত সন্ধান পাইলাম না! যাহারা ছিল, সকলেই ত নৈরাশ্যের ম্লান-আঁধার লইয়া একে একে চলিয়া গেল।

• • • •

যতগুলি পাখী ছিল, গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল, বনের বিলাপ তান,
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা, জাগিয়া চাহিল প্রাণ,
কখন বসন্ত গেল, এবার হ'ল না গান!

• • • •

রুদ্ধ আবেগ

সুষুপ্ত রজনীর কোলে বিনিদ্র নয়নে কত কাঁদিয়াছি, কত আকুল আগ্রহভরে পথের পানে তাকাইয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আসিল না! বৃথা, বৃথা!

০ ০ ০ ০

পনের দিন কাটিয়া যাইবার পর, বাবা আজ বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। চক্ষে সে দীপ্তি নাই, মুখে সে হাসি নাই—যেন কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিষাদের কোলে মাথা ঢাকিয়াছিলেন, আজ উঠিলেন। অন্তরে তাঁহার কেবল চিন্তা—চিন্তা, কি করিয়া আমায় সুখী করিবেন, তাহারই চিন্তা!

০ ০ ০ ০

কিন্তু সে আজ কোথায় গো? যাহার স্মৃতিধ্যানই আমার একমাত্র উপাসনা, যাহার পত্র আমার ইহজীবনের ধর্ম্মগ্রন্থ! হায়, পৃথিবীতে যে তাহার দানের প্রতিদান দিতে পারি নাই, প্রেমাশ্রু অভিষেক করিলে সে ঋণ আমার পরিশোধ হইবে কি? এ ক্ষুদ্র লাঞ্ছিতা জীবনের নৈবেদ্যে সে দেবতার পূজা হইবে কি? ওগো—

যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে র'বে টানিতে,
সকলের তরে র'বে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

বড় অভিমান করিয়াই ওগো দেবতা আমার, তুমি চলিয়া গিয়াছ! আজ তাহারই স্মৃতি শত বৃশ্চিকের মত পলে পলে

আমায় দংশন করিতেছে। ইহাদের হস্ত হইতে কি করিয়া মুক্তি পাই ?

কুন্তলার কাছ হইতে কাল একখানি পত্র পাইয়াছি। পবিত্র স্নেহ-প্রীতির উপহারস্বরূপ স্বামীর কাছ হইতে সে যাহা উপহার পাইয়াছে, তাহারই গর্ব্বে শূন্য বক্ষখানি আজ তাহার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজ সে জগতে মাতৃত্বের অধিকার পাইয়াছে,—অনাবিল স্বর্গীয় প্রেমের অধিকার আজ তাহাকে জগদীশ্বর নিজে দিয়াছেন। কুন্তলা লিখিয়াছে,—সে মহামূল্য রত্ন আজ ভগবান আমাকে দিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ কর মীনু-দিদি, দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াও সে যেন মানুষ হইয়া উঠে !

বাবা ঘরে ঢুকিলেন, মুখ তাঁহার গম্ভীর, তথাপি স্নেহসিক্ত স্বর—মীনু !

তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়াই উত্তর দিলাম।

বাবা বলিলেন—না মা, ভেবে দেখলুম্, তোর আশা পূরণ করাই আজ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ! এ তোর মায়ের আদেশ ! বল্ মা, আজকেই অরুণকে লিখে দি'—সে এখানে চলে আসুক। হোক্ সে হিন্দু, তবু তার হাতেই তোকে আমি দেব। কিন্তু হাঁ মা, তা হলে এ বুড়ো ছেলেকে ছাড়্তে হবে যে !"

চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিতেছিলেন—"নইলে সারাজীবন ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ কামনায় আপনাকে ঢেলে দিয়ে, বাকী ক'টা বছরের জন্যে আবার কেন মা লোকের নিন্দা, গ্লানি

কুড়িয়ে বেড়াব? 'আচার্য্য' পদ পাবার জন্যে আমি লালায়িত নই, কিন্তু মা, সমাজ? তাকে আমি বড় ভয় করি! বল্ মীনু, আজই তা হলে অরুণকে লিখে দি'! বল্ মা?"

বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে! ওগো প্রভু, এ কি মহা সমস্যায় আজ তুমি আমার ন্যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল নারীকে ফেলিয়া দিলে?

বাবা বলিলেন—আমার জন্যে ভাবিস্ নে মা! আমি আর ক'টা দিন বল্ না? ক'টা দিনের জন্যে সারা জীবনটাকে নষ্ট করিস্ নি। খুব ভাল ক'রে ভেবে দেখ্! এই ত তোর মামারা! তারাও তো হিন্দু মা! তোর মাকে যখন বিয়ে করি,—না, তুই ভাল ক'রে ভেবে দেখ্! মীনু।

কাহার একটী কাতর সুর যেন বাতাসের সহিত জড়াইয়া জড়াইয়া কানে আসিয়া বাজিতেছিল—

শুধু তব ধন করি আশ
আমি পরিয়াছি দীন বাস
শুধু তোমারি লাগি করিয়া আশ
মরমের কথা কহি গো!

আঃ, এ কাহার মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ গো! আহা বেচারী আমার! এ কী আত্মত্যাগের বাণী তুমি শোনাইতেছ, ওগো ভোলা পথিক! যুগ যুগ ধরিয়া ও-কাতর আহ্বান চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তোমার ও-আশা সফল হইবে না।

বাবা বলিলেন—তবে ভেবেই দেখ্ মা, কাল আমায় বলিস, বুঝলি ?

বাবা উঠিয়া গেলেন। মূঢ় স্তম্ভিতের ন্যায় নিশ্চল দেহ লইয়া আমি সেইখানেই বসিয়া রহিলাম।

ছাব্বিশ

শ্রান্ত ক্লান্ত সূর্য্য যখন সমস্ত দিনের কার্য্য শেষ করিয়া জগতের কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, নিমেষের অন্তরালে কে থাকেন, কে জানে ?—অমনি সন্ধ্যারাণীকে পাঠাইয়া দেন। সুখ-আবর্ত্তনের অন্তরালে থাকিয়া জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্ক শেষ একখানি করিয়া দুঃখ-দৈন্যের যবনিকা, কে ফেলিয়া দেয়—কে জানে ? যে-ই হউক, অভিশপ্তা নারী আমি, তাঁহাকে সহস্র নতি করিতেছি। কৈ, পূর্ব্বে ত এমন ছিলাম না !—যাক্।

'মীনুদি' ?"

"কে, মনীষা ? আয় ভাই, কবে এলি ?"

"আজকে। একি মীনু-দি,' তোমার অসুখ করেছে না-কি ?"

"দূর পাগ্‌লী, অসুখ কেন কর্‌তে যাবে ? স্নান করিনি, তাই অমন দেখাচ্ছে।"

মনীষা হাসিয়া উঠিল—স্নান না কর্‌লে চোখ ব'সে যায়, কণ্ঠা বেরিয়ে পড়ে, না মীনুদি ?"

... মেয়েটাও দেখিতেছি ছাড়িবে না। ওরে অভাগী, এ ব্যথা জানিবার জন্য তোর এত আগ্রহ কেন রে?"

"শ্বশুরবাড়ী কেমন দেখ্‌লে, মনীষা?"

"খুব ভাল, মীনু-দি' কি পেরকাণ্ড বাড়ী,—মটর, ঘোড়া—"

"তা নয় মনীষা, গরু ঘোড়ার কথা বলি-নি, শ্বশুর শাশুড়ী কেমন?"

"তা ভাল মীনুদি'!"

"আহা, তাই হউক! বিশ্বের কাছে অপরাধ করিয়া একে ত দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিস্, আজ দেবতার বরে গিয়া পুণ্য-আশিস লাভ কর্ বোন্!"

° • ° ° • °

স্কুল হইতে বাবার নিকট একখানি চিঠি আসিয়াছে। মণিকা-দি' লিখিয়াছেন, সেই যে আট দিনের ছুটী লইয়া আমি প্রায় চারিটা মাস স্কুল যাই নাই, তাহাতে লেখাপড়ার ক্ষতি এবার না-কি যথেষ্ট হইয়াছে,—প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া কষ্টকর হইবে, সন্দেহ নাই।

বাবা বলিলেন—"কি লিখে দি' বল্‌তো মীনু? বোর্ডিঙে আর যাবি?"

বলিলাম—"যাব বাবা!"

"তাতে আমার বড় কষ্ট হবে কিন্তু মা? খাওয়া দাওয়া, দেখা আর ও-বুড়িটার দ্বারা হয়ে ওঠে না।"

সত্যই তো, ছিঃ! তাঁহার খাওয়া পড়ার তত্ত্বাবধান করিবার কেহই নাই, আর আমি—

"না বাবা, লিখে দাও,—বোর্ডিংএ আর আমি যাব না!"

"তাই—দি'!" বাবা উঠিয়া গেলেন।

দারোয়ান চলিয়া গেল, বিছানা-পত্রগুলি বাঁধিয়া আনিবার উপদেশ দিয়া আমি উপরে উঠিয়া আসিলাম। সহসা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বাবা ডাকিলেন—"মীনু! মিনতি!"

"কি বাবা!'

"এই দেখ মা, টাটা থেকে অরুণের টেলিগ্রাম এসেছে! যত শীগ্‌গীর পারি যেতে লিখেছে। কি জানি মা, এই হয় ত ঈশ্বরের আদেশ—ইচ্ছা সব, এই যাওয়ার উপলক্ষ্যই হয় তো তোমাদের জীবন দুটীকে একসঙ্গে বেঁধে দেবে! চল্ মা, আজই যাই। আমিও ভেবে দেখেছি মিনতি! ওই অরুণের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো।"

"কিন্তু—"

বাবা বলিলেন—"সে হিন্দু, এই কথা বল্‌ছিস্? তাতে আমার কোন আপত্তি নেই মিনতি! আমি আর ক'টা দিন মা?"

ওগো নির্ম্মম সত্য-সুন্দর, আজ এ আবার কি মূর্ত্তিতে তুমি দেখা দিলে? যে রুদ্র-বাণী এতদিন আমার কর্ণে শুনাইয়াছিলে, তাহা অপেক্ষা ইহা যে কত সুন্দর!—মা গো, আজ যেখানেই থাকিস্, তাকাইয়া দেখ্, অভাগিনী কন্যা তোর, তোরই ইচ্ছা পালন করিতে চলিয়াছে! কিন্তু কিসের এ আহ্বান?

তা হলে লিখে দি' মা তাকে? কিম্বা চল্, তার বাড়ীতে গিয়েই উঠি। হাঁ হাঁ, সেই ভাল মা! মুকুন্দ, মুকুন্দ! কোথায় গেল বেটা?"

এখনি একখানা টাইম-টেবল কিনে আন মুকুন্দ! যাও, শীগ্‌গীর।

তুই সব গুছিয়ে নে, মা! কি জানি, আর দেরী কর্‌তে ভয় হচ্ছে! তুই শীগ্‌গীর নে মা! আমি আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নি!

বাবা উঠিয়া গেলেন। আঃ, ওগো আজ বুঝি অন্তরের সমস্ত অন্ধকার নাশিয়া গেল। প্রিয়তম, দেবতা আমার! আমার এ পবিত্র শুভ্র অর্ঘ্য লইয়া আমার নারীজীবনকে ধন্য করিয়া দাও, তোমার ও নিষ্কলঙ্ক সুন্দর চরণে স্থান দিয়া আমায় পবিত্র করিয়া লও গো! নারী আমি, পৃথিবীতে সমস্ত অধিকারহীনা, তোমার ভালবাসা পাইবার অধিকার আজ আমায় দান করিয়া কৃতার্থ কর—ওগো সত্যসুন্দর! হে আমার গোপন-চিত্তের নিভৃত দেবতা! সমস্ত অপরাধ আমার ভুলিয়া যাও, আজ তোমারই দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিখারিণী আমি! আজ তোমার আহ্বানকে সগৌরবে মাথায় করিয়া চলিয়াছি।

আমার মুগ্ধ প্রাণে, ওগো প্রেম-ধারা ঢেলে দাও,
আমার মুগ্ধ চোখে, সুষমা ছড়ায়ে দাও,
তোমারে ডাকিতে প্রাণে প্রাণে—
মোরে শিখাইও প্রভু, শিখাইও।
তোমারে খুঁজিতে পথখানি
উজলিও সখা উজলিও—

রুদ্ধ আবেগ

ওগো আমার হৃদয়-দেবতা! আপনার করিয়া আমায় গড়িয়া লও, আপনার মত সুন্দর করিয়া আমায় শিখাইয়া তোল, তোমার ও-সুন্দর কোমল স্পর্শে আজ সমস্ত বিষাদ-জড়িত, কালিমা-লিপ্ত দুর্ভাবনার জাল ছিঁড়িয়া দাও, আজ আবার নূতন জীবন লইয়া সংসার-পথে নামিয়া এস গো!

দিদিমণি!

চমকিয়া উঠিয়া পেছন ফিরিতেই দেখিলাম, মুকুন্দ দাঁড়াইয়া। টাইম্-টেব্‌ল এনেছ মুকুন্দ? কৈ, দেখি।

বাবা ঘরে ঢুকিলেন। বইখানা অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে বলিলেন—বিকেল সাড়ে ছটায় ট্রেণ মিনতি, তার আগেই আমাদের ঠিক হয়ে নিতে হবে। মুকুন্দ, যাবি ত সঙ্গে?

বাদলসিক্ত আকাশের কোলে পুঞ্জীভূত কালো মেঘগুলি এতদিন চারিদিক অন্ধকার করিয়াছিল, ওগো আজ আবার কে তুমি তোমার সুন্দর সহাস্য আনন লইয়া মেঘগুলাকে সরাইয়া দিলে? এ যে আমি আশাও করিতে পারি নাই, কল্পনায় আনিতেও সাহস হয় নাই! কেন আজ এ কাঙালিনীকে স্বেচ্ছায় ডাকিলে গো?

অরুণবাবুকে আবার আমি পাইব, ইহার চেয়েও—কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে! হউক, তাঁহার জন্য শুধু ধর্ম্ম কেন, সমস্ত জগত ছাড়িয়া যাইতেও আমি প্রস্তুত। ওগো আমার প্রাণের প্রিয়-দেবতা! তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমার পথখানি উজ্জ্বল করিয়া রাখ!

নে মা, দেরী করিস্ নি! সব গুছিয়ে গাছিয়ে নে। হাঁ মুকুন্দ, একবার ষ্টেশনে গিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ—আচ্ছা থাক, আমি ই যাচ্ছি, তুই দিদিমণিকে সাহায্য কর্, চট্ পট্,—বুঝ্লি? ইস্, সময় যেন আজ আর কাটিতে চায় না।

কিন্তু কেন?

সাতাশ

কাল রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কি হইল গো! মরীচিকা-লুব্ধ পথিকের মত ছুটিতে ছুটিতে এ কোথায়, কোন সীমানায় আসিয়া পড়িলাম গো! দেখিয়াছিলাম সুতীব্র উজ্জল আলোক, কিন্তু এ সূচীভেদ্য অন্ধকারে কে টানিয়া আনিল?—মূঢ় ভ্রান্ত ওরে, এ যে আলেয়ার আলো!

যে উচ্চাশা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধরিয়া ছুটিয়া আসিলাম, কে জানিত, তাহার সৃষ্টি ব্যর্থতার মধ্যে। যাহার সুন্দর চরণ-যুগলকে বক্ষে ধারণ করিতে আসিলাম, আজ যে তিনি শয্যাশায়ী। কে জানে, এ কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন কি না? তাহাই হউক ভগবান্, যে তরুণ পুষ্প অকালেই শুকাইয়া উঠিতেছে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ দেবতা! নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মত

ছিঁড়িয়া ফেলিও না, তোমার সুধারস দানে আবার তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল।

ডাক্তার আসিয়াছিল, বলিয়াছে, রোগ কঠিন সন্দেহ নাই, তবে জীবন-মরণের ভার না-কি ঈশ্বরের হাতে, অদৃষ্ট উপলক্ষ মাত্র,—তাই যত্ন, সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম। জীবনের মূল্য তাহা অপেক্ষা কত উচ্চ, কত প্রয়োজনীয়।

চারিদিকেই লোহার শব্দ। কাণ যেন ফাটাইয়া দেয় এমনিই। আহা, তবুও ইহার মধ্যে কেমন একটা মিষ্টতা, কেমন একটা কমনীয়তা আছে।

এই যে কুলী-বালকেরা ঘর্ম্মাক্ত-বয়ানে, অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে, বিশ্রাম নাই—ক্লান্তি নাই, না জানি, ইহাদের জীবন কত বৈচিত্র্যবিহীন—কত অনাড়ম্বরপূর্ণ। জগতে আসিয়াছে দুঃখের বোঝা চাপাইয়া,—আবার চলিয়াও যাইবে ঠিক্ তেমনি একটা দৈন্যতার বোঝাকে ঘাড়ে লইয়া। সুখ ভগবান্ ইহাদের দেন নাই, তবু ইহারা কত সুখী, কত শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাইয়া দিতেছে!

হায় রে! মনুষ্য-জীবনের সফলতা তো এইখানে। সারা-জীবন ভরিয়া শুধু অভিশাপ, গালি কুড়াইয়া যাহারা দুই মুঠা অন্নের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলকে বরণ করিয়াছি, তাহারাই হইল দেশের নীচ, অসভ্য ;—আর যাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বিলাসিতার সু-উচ্চ হর্ম্মে বসিয়া ইহাদের উপর অযথা

প্রভুত্ব চালাইতেছে, তাহারাই দেশের মনুষ্য—আশা ভরসা সব, পৃথিবীর আলোক তাহাদের নিকট পৌঁছায় না, সভ্যতার রশ্মি তাহারা দেখে নাই,—তাহাদের অপরাধ এই। তবু তাহারা কত বিনয়ী, কত নম্র।

বেহারা সেদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল—সাহেব এক একদিন রাতে কারখানাতেই থাকিয়া যা'ন। খানা-পিনার ফুরসৎও খুব কম জোটে। শুধু কারখানা কেন, সমস্ত টাটা নগরে তাঁহার যে সুখ্যাতি আছে, শুনিলে তাহাদেরই আনন্দ হয়! হাজার হউক, তাহাদেরই মনিব তো! প্রভুর বিজয়-বার্তায় কোন্ ভৃত্য গর্ব্বিত না হয়? ইহাই তো স্বাভাবিক। ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তবু এ কী আধ-আলো, আধ-কালো-মিশ্রিত জাগ্রত স্বপনের মত হৃদয় আমার পুলকে দুলিয়া উঠিতেছে? তবু ক্ষণে ক্ষণে বুকটা যে কাঁপিয়া উঠে, পা দুইটা যে দুলিয়া উঠে, অন্তর হইতে কে বলিয়া উঠে—ওরে অভাগিনী, আজ যে আঘাতকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিস্, কোথায় তাহার সার্থকতা রে, কে তাহার সামর্থ্য দিল?

এই তো সকল অনাদর—সকল অভিমান উপেক্ষা করিয়া দয়িতের আহ্বানে উপেক্ষিত—অনাদৃত সেই দয়িতের কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়াছি। ভিখারীর মত ভিক্ষাই যে সে আমার উদ্দেশ্য গো! আজ যে সকল অহঙ্কার—সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছে গো! রিক্ত আজ, শূন্য আজ আমি।

মীনু! শুনছিস মা?

পেছন ফিরিয়া দেখিলাম—বাবা। আগ্রহভরে তিনি বলিলেন—অরুণ এখন কেমন আছে মা? জ্বরটা ছেড়েছে?

শীর্ণ তাঁহার মস্তকটা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলাম, দেহের উত্তাপ তখনও যথেষ্ট। বলিলাম—না বাবা, কমে নি মোটে

তুই খেয়ে আয় না মা, আমি বসছি।

বলিলাম—না বাবা, আজ খাব না, শরীরটা মোটেই ভাল নেই।

অন্তরে যাহার আকুল আগ্রহ—ব্যাকুলতা, আহারে প্রবৃত্তি তাহার কোথায়? আহার করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ হইতেছিল না! তাঁহার মাথাটাকে কোলে লইয়া বসিয়াই রহিলাম।

বাবা বলিতেছিলেন—কি করিব মা, অরু না উঠ্‌লে আমিও তো যেতে পার্‌ছি না। এ-ধারে সমাজের উৎসবের সময় এসে গেল, তারও তো আয়োজন কর্‌তে হবে! জানিস তো, আমি না থাক্‌লে মন্দিরের কোন কাজই হয়ে উঠে না! বড়ই ভাবিয়ে তুল্‌লে, মা!

বাবা চলিয়া গেলেন, অরুণবাবুর মাথাটা কোলে লইয়াই স্থিরভাবে আমি বসিয়া রহিলাম। কে জানে, এ প্রয়াস, এ যত্ন-সেবার সাফল্য কোনদিন পাইব কি না? আজ যে সেই অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াই বসিয়া আছি দেবতা! সে মুহূর্ত্ত কি আসিবে না?

উঃ! কে তুমি? অরুণবাবু মুখ ফিরাইলেন। মলিন-কাতর মুখখানি তাঁহার ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল চেতনা যেন ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

রুদ্ধ আবেগ

কে, মিনতি? তুমি—তুমি কখন এলে? এ যে আমি কখন আশাও করি-নি মিনতি? রণেনবাবু আসেন নি?

আজ কোন্ ভাষা দিয়া তোমায় জানাইব গো, অভিশপ্তা নারী আমি, তোমার আরাধনা করিতেই ছুটিয়া আসিয়াছি। হীন এ অন্তর, তোমার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য ব্যকুল! রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—তিনি আসেন নি, বাবা এসেছেন কাল রাতে।

হতাশব্যঞ্জক মুখে কে যেন একটা তৃপ্তির আভাস ফুটাইয়া তুলিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—জানি মিনতি, আমার অসুখ শুন্‌লে কিছুতেই তুমি সুস্থির থাক্‌তে পার্‌বে না, তাই সকলের আগে তোমাকেই টেলিগ্রাম করেছিলুম্। কিন্তু আজ কুন্তলা যদি থাকতো, সুধীর যদি থাক্‌তো—কে জানে, তারা কোথায় আছে! যেখানেই থাকুক, যদি তারা আজ—

সহসা বলিয়া ফেলিলাম—আমি জানি।

আগ্রহভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন—জানো মিনতি,—জানো?

জানি।

কোথায় তারা আছে মিনতি? বল, আজই তাদের লিখে দি' এখানে চলে আস্‌তে। যে ভার স্বেচ্ছায় তোমায় দিয়েছি, আজ সে গুরুভার থেকে তোমায় মুক্ত কর্‌তে চাই! বল, কোথায় তারা আছে?

আজ কি করিয়া তোমায় বুঝাইব দেবতা, যে ভার তুমি দিয়াছ, সে ভার দেবতার আশীষের মতই আমার কাম্য, পবিত্র অর্ঘ্য যে গো! তাহা হইতে মুক্তি যে আমি চাহি না গো! যে দান

স্বেচ্ছায় করিয়াছ, আর তাহা কাড়িয়া লইও না। দাও, সে ভার পালন করিতে দাও। নারী আমি, দাসী আমি, অন্তরের পূর্ণ আনন্দ লইয়া তাহা পালন করিব।

অরুণবাবু বলিতেছিলেন—কে জানে, মিনতি, আর হয় তো আমি বাঁচ্‌বো না। দিন রাত্রি-অন্তরের মধ্যে এই কথাটাই এই ভাষাটাই, কে যেন আমায় বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে। উড়িয়ে দিতে চাই, মুছে দিতে চাই, মুছে না। কালীর দাগের মত আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। দাও মিনতি, আজই তাদের লিখে দাও, আসুক তারা—শেষ একবার তাদের দেখ্‌তে চাই,—আর হাঁ, রণেনবাবুকে—যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তাঁকেও—ও কি চম্‌কে উঠ্‌লে যে? মিনতি—মীনু—

এ কী বিদ্রোহী আন্দোলন আমার স্থির নিশ্চল প্রাণে জাগাইয়া দিলে গো! এ প্রাণ যে তোমারই দেবতা! কেমন করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিব? যুগ যুগ ধরিয়া এ তৃষিত অন্তর যে তোমাকেই চাহে গো, তোমারই নাম—তোমারই স্মৃতি যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র আলোক-রেখা মিনতি!

সে কী মীনু, তবে তুমি এখনও—উঃ, বড় যন্ত্রনা মিনী?

সহসা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি পাশ ফিরিলেন। এ কী! কেন এমন হইল? নির্ম্মম ওগো সত্যসুন্দর, তোমার দিব্য জ্যোতিঃ এ অন্ধকারে ফুটাইয়া তোল গো!

বাবা ডাকিলেন—মীনু!

আটাশ

চারিটা দিন কাটিয়া গেছে, কিন্তু কৈ, জ্ঞান তো আর আসে নাই। সেই যে সেদিন জ্বরের প্রাবল্যে প্রলাপ বকিতে বকিতে জ্ঞান হারাইয়াছেন, চক্ষের সম্মুখ দিয়া প্রতি পল—প্রতি দণ্ড লইয়া এই তো চারিটা দিন কাটিয়া গেল। আধ-আলো আধ-কালো জাগ্রত স্বপনের মত কখন চেতনা ফিরিয়া আইসে, আবার নিমিষে চলিয়া যায়!—দূর চক্রবালপ্রান্তে সূর্য্যরশ্মির শেস হাসি—কান্নার মত। এ মহা-মিলনেয়, শুভ মিলনের পূর্ব্বে এ কী বাধা, এ কী বিঘ্ন দীর্ঘ প্রাচীরের মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল গো!

মা-আমার, এই জগতের বাহিরে আজ যেস্থানেই থাকিস্, শুধু আশীর্ব্বাদ কর্ মা, যেন এ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিতে পারি,—মৃত্যু-কামী পথিককে মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারি। শুধু এই আশীর্ব্বাদ চাহি, আর কিছু নহে। অভাগিনী নারীর ভিক্ষা, সফল কর্ মা!

কুন্তলাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি, কে-জানে, হয় ত আজই সে আসিবে,—আজই আমাকে সেবা-পরিচর্য্যার ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেবতা আমার, কাঙালিনীকে যে অধিকার স্বেচ্ছায় দিয়াছিলে, আজ তাহার কোন্ অমার্জ্জনীয় অপরাধে আবার তাহা কাড়িয়া লইতেছে? সমস্ত ত্যাগ করিয়া যে আজ এই সেবাটাকেই জীবনের সব চেয়ে মহৎ,

সব চেয়ে বড় 'পাওয়া' করিয়া লইয়াছিলাম, ইহাই যে একমাত্র সম্বল ছিল গো! কিন্তু সমস্ত হারাইয়া পথিকের মত আজ এ রিক্ত, উপেক্ষিত অন্তর লইয়া কোথায় যাইব? কে তাহার সাদর আলিঙ্গনে আমাকে ডাকিয়া লইবে?

কুন্তলা, দিদিটী আমার! চাহিয়া দেখ্, আজ তুই বিজয়ী—গর্ব্বী, আর ধূলায় লুণ্ঠিত উপেক্ষিত আমি,—নিন্দনীয় আমি! পৃথিবীতে আজ আমার চেয়েও তুই প্রশংসনীয়া—বরেণ্যা!—

নির্জ্জন ঘরের মাঝে একাকী আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, সহসা বাবা ডাকিলেন—মীনু।

স্নেহসিক্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন—কাঁদিস্ নি মা, ভয় কি! অরু সেরে উঠ্বে,—তবে দেখিস্, সেবা কর্তে ভুলিস নি, তাহলে জীবনে বড় অনুতাপ পাবি। কাঁদিস্ নি মা! রুগীর ঘতে তো অমন করে কাঁদ্তে নেই। তার চেয়ে বরং তাঁকে ডাক্—এ মহাপরীক্ষায় যিনি আজ তোকে ফেলেছেন! হাঁ, আজ তারা আস্বে, বল্ছিলি না? তা ঘরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখ্। নে মা, চট্পট্!

বাবা চলিয়া গেলেন। অরুণ বাবুর নিদ্রিত দেহটী ধীরে ধীরে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এ বিশ্বে—সমগ্র জগতে, কৈ, আজ কাহারও করুণ সহানুভূতি পাইলাম না তো! বিরাট মৃত্যু-দেবতা! দুর্জ্জয় দূতগুলিকে তোমার, ফিরাইয়া লও গো! নারী আমি, কাঙালিনী আমি, শুধু এই প্রার্থনাই তোমার নিকট করিতেছি। শত সহস্র নতি আমার, তোমার চরণে গিয়া পৌঁছাক।

*　　　*　　　*　　　*

কুন্তলা আসিয়াছে, মাতৃত্বের পূর্ণ গর্ব্বে আজ সে গর্ব্বিত, তৃপ্ত ; জগতে তাহার দাবী আজ যথেষ্ট। যে কলঙ্কের ধারা, নিন্দার স্রোতকে জীবনের ভূষণ করিয়া বরিয়া লইয়া সে আপনার পথ বাছিয়া লইয়াছিল, আজ সে কলঙ্ক তাহার, ঝরিয়া গিয়াছে, সে নিন্দা তাহার, লোপ পাইয়াছে। আজ সে মুক্ত, সুখী! হোক না দরিদ্র, হোক না দীর্ণ, অতি উচ্চ ধনীর গৃহে যে সুখ পাওয়া যায় না, আজ তাহার দীর্ণ জীর্ণ কুটীরে সে সুখ আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে। কুন্তলা, কুন্তী –দিদিটী আমার! আজ আমিই যে রিক্ত ভাই, পাথেয় আমার শূন্য—ভিখারীর মত। কে তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে ?

ডাক্তার বলিয়াছে, জীবনের আশা যে একেবারে করা যায় না, তাহা নহে। সেবা ও শুশ্রূষার গুণে মৃত্যুপথ না-কি অনেকটা অতি-ক্রম করিয়াছেন। তবু এখনও যথেষ্ট সেবা চাই—যত্ন চাই—প্রাণের আবেগ চাই। মরণকামী পথিকের পক্ষে এগুলা না-কি বড়ই প্রয়োজনীয়।

মীনি।

চমকিয়া পেছন ফিরিতেই দেখিলাম, কুন্তলা দাঁড়াইয়া, কোলে তাহার শিশুটী! মুখ ফিরাইতেই কুন্তলা হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এখানে কি কর্‌ছিস্ রে ?

তোর কথা ভাব্‌ছি !

ইস্! আমার, না দাদার ?

খোকার গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া সস্নেহে বলিলাম—এই খোকাটীর মায়ের ! কি বল খোকা, মা বড় দুষ্টু, নয় ?

অবোধ শিশু কথা বুঝিল কি-না, কে জানে ? খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কুন্তলা বলিতেছিল—সত্যি ভাই মিনী, তোর টেলিগ্রাম যখন পেলুম, তখন এত ভয় হয়েছিল আমার, সে রাত্রে কিছুই খাই নি; শুধু কেঁদেই কাটিয়েছি ! দাদার জীবনের যদি কেউ অধিকারী থাকে, সে একমাত্র তুই-ই মিনতি তুই। মরণের পথ থেকে টেনে এনেছিস, এ উপকারের প্রতিদান নেই, পৃথিবীতে বোধ হয় হতেও পারে না ! মিনী, বোর্ডিঙের কথা মনে পড়ে ?

অস্ফুটস্বরে বলিলাম—পড়ে ভাই—

আজও আমার মনে হচ্ছে মিনী, আমরা দুটীতে ঠিক যেন সেই বোর্ডিংএই আছি। আমাদের বন্ধুত্ব কোন্ শুভলগ্নে স্থাপিত হয়েছিল জানি না, কি শুভ মন্ত্রে সাধিত হয়েছিল, জানি না ভাই ! তবে এ কথা বিশ্বাস না ক'রে থাক্তে পারি না যে, পৃথিবীর বাইরে যে অচেনা দেশ আছে, সে দেশে আমরা দুটীতে ছিলুম ঠিক এক তারে, এক প্রাণ হয়ে ! এক সুরে আমাদের দুটী প্রাণ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্তো, এক গান আমাদের অন্তর গেয়ে উঠ্তো,—তাই এ জগতে এসেও আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি-নি। বল্ ভাই, ঠিক তাই কি-না ? সত্যি কথা বল্বো কি মিনী, আমার অন্তর এখন সেই দিনের প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। যে দিন তোদের মিলন-আলোকে এ বাড়ী সোনার আলোয় রঙিয়ে উঠ্বে, উৎসবের বাজনায় চারিদিক

মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে, ঠিক সেইদিনটীর প্রতীক্ষাই আমি কর্‌ছি! মিনী!

কেন ভাই?

সত্যি কথা বল্‌বি ভাই? বল্‌ সত্যি ক'রে, দাদাকে তুই কেমন, কতটা ভালবাসিস্‌?

হা রে অভাগী! আজ এ প্রশ্নের উত্তর মুখের বাণীতে দিতে হইবে তোকে? এতদিন অন্তরের প্রতি বিন্দুটীতে ইহার উত্তর যে জড়াইয়া আছে গো। বলিলাম, তুই এ কথা জিজ্ঞেস্‌ করছিস্‌ কুন্তী?

ক্ষমা কর ভাই, ভুলে গিয়েছিলুম, ঈশ্বরের কাছে দিন রাত প্রার্থনা কর্‌, তোর এ আকাঙ্ক্ষা যেন সফল হয়! ভুলিস্‌ নি বোন্‌!

কুন্তী, দিদিটী আমার, ইহা যে ভুল হইবার নহে ভাই! জাগ্রতে, স্বপনে, নিদ্রায় ইহাই যে আমার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান ভাই!

মীনু!

কুন্তলা ডাকিল—ভিতরে আসুন কাকাবাবু?

* * * *

আকাশ, জল, বাতাস, আলো
সবারে ক'বে বাসিব ভালো
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
—সবারে যাব তুষি!

দশটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। অরুণবাবু সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে সে দুর্ব্বলতা এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই। মরণের পথ হইতে

চলিয়া-আসা যুবক, অভিমানের তীব্র আবেগে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার যে প্রয়াস লভিয়াছিল, আজ তাহারই অনুশোচনা তোমার অন্তরকে বিদগ্ধ করিবে যে গো !

গোধূলীর রক্তিম-আলো আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গাছের পাতায় পাতায় অপূর্ব্ব সে রঙীন আলো ফলিয়া উঠিয়াছে। জীবন-পথের কাহার একখানি সু-উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাহারই দিকে আমি তাকাইয়া ছিলাম। এখানে আসিয়াছি, এই তো একমাস হইল। শুধু ব্যর্থতাই আমার জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছে ! নাই নাই, ওরে অভাগিনী—তোর ও-তৃষিত অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে কেহই নাই—অতৃপ্ত, উপেক্ষিত তুই, ফিরিয়া যা ! ব্যাকুলতার মূল্য আজ হীন, দরিতের দুয়ারে এক বিন্দু শান্তিজলের জন্য মাথা ঠুকিয়া মরিলেও কেহ আসিবে না। আপনার গরবে আজ সকলেই উন্নত, ভিখারী তুই, কাঙালিনী তুই, কে তোর দিকে তাকাইবে যে ? না—না, বৃথা—বৃথা সে আশা !

নির্জ্জন শূন্যঘরে একা বসিয়া আছি, সহসা কাহার একটী করুণ স্নেহসিক্ত স্বর আসিয়া আমার কর্ণে বাজিল—মীনু !

এ তো সেই স্বর ! ওরে অভাগিনী, এই স্বরই তো একদিন তোর সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া তোকে পথের ভিখারী করিয়াছে রে !

সম্মুখের চেয়ারটার উপয় বসিয়া পড়িয়া তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—আমি যে তোমায় সব জায়গায় খুঁজে এলুম মিনতি, তুমি এইখানে, কে জানতো বল ? মিনতি !

আমার হাত দুইখান তাঁহার কোলের উপর টানিয়া লইয়া আবার ডাকিলেন, মিনতি—মীনু !

কী উত্তর দিব গো ! স্বর যে রুদ্ধ হইয়া আইসে, কণ্ঠের শক্তি নাই, কেমন করিয়া উত্তর দিব ?

ভেবেছিলুম মিনতি, এ শূন্য মূল্যহীন জীবনটাকে কাজের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেব, যাতে আর কারও চিন্তা, আর কারও মূর্ত্তি তোমার শূন্য আসনকে অধিকার করতে না পারে। ভেবেছিলুম, এ জীবনে, না হয় পরলোকে গিয়ে তোমায় পাব—সেখানকার বাধা-বন্ধন সমস্ত এড়িয়ে। তাই মিনতি, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু বড় কষ্ট যে ভাই, শেষ মুহূর্ত্তেও যাতে তোমায় দেখতে পাই, টেলিগ্রাম করলুম, তার পর—তার পর শুনলুম, তুমিই না-কি আমায় মরণের গ্রাস থেকে অতি কষ্টে টেনে এনেছ ? মীনু, লক্ষীটী আমার !

ওগো স্বর্গের দেবতা,—ভাষা কাড়িয়া লইয়া কেন আমায় এমন মূক করিয়া দিলে ? এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম গো—

কেঁদো না মিনতি, আজ সে ঋণের কিছু শোধ আমি দিতে চাই ! বল—বল, নেবে তুমি—প্রত্যাখ্যান করবে না ?

আলোক অন্ধকারের মাঝে এ কী বিদ্যুৎ-রেখা ঝলসিয়া উঠে ! অস্ফুট স্বরে বলিলাম—এমন ত কিছুই করি-নি—

করেছ মিনতি, করেছ ! যে জীবন চলে যাচ্ছিল, তাকে ফিরিয়ে এনেছো ! লোকে জিনিস হারায়, আর একজন কুড়িয়ে পায় ! সে কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিস কা'র হয় মিনতি ?

মুখ দিয়া আমার কথা বাহির হইতেছিল না, বুকটা কেমন দুলিয়া উঠিতেছিল, নীরবেই বসিয়া রহিলাম। অরুণবাবু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—তেমনি আমার ও প্রাণটাও হারিয়ে যাচ্ছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ, তবে এ প্রাণ কার প্রাপ্য মিনতি ?

আবেগে সাদরে আমায় তিনি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। শক্তি-হীনা আমি, তাঁহার বুকেই লুটাইয়া পড়িলাম। এ কী মদিরা গো !

শাঁক বাজাতে পারি, দাদা ?

দুয়ার ঠেলিয়া, দুষ্টুমীপূর্ণ হাস্যে মুখ ভরাইয়া কুন্তলা ঘরে ঢুকিল।

এ কী পুলকের তীব্র আবেগ সমস্ত ধমনী বহিয়া ছুটিয়া চলিল গো ! সন্ধ্যার স্তিমিত আগমনে তখন শঙ্খের কোলাহল বায়ুস্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। দূর হইতে কাহার অস্পষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—

তোমারেই করিয়াছি জীবনেরি ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হ'ব না'ক পথহারা।

শেষ